ভারতবর্ষ ও চীন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
H/195

ভারতবর্ষ ও চীন

ভারতবর্ষ ও চীন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ
১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : প্রভাসচন্দ্র সরকার
এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাঃ লিঃ
১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

৮ই শ্রাবণ ১৩৭০
জুলাই ১৯৬৩

তিন টাকা

প্রচ্ছদ-শিল্পী : বিভূতি সেনগুপ্ত
ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পটভূমিকায় রচনাটির আবির্ভাব। ভারতের সঙ্গে চীনের বহুঘোষিত বহুশতাব্দীর বন্ধুত্ব যখন চীনের অতর্কিত ভারত-আক্রমণে বিধ্বস্ত সেই মুহূর্তে রচনাটির জন্ম। আক্রোশ বা বিদ্বেষের মন এ রচনার পিছনে কাজ করেনি। তবে হ্যাঁ, বেদনা অবশ্যই আছে। দীর্ঘকালের বন্ধুত্বের অপঘাতে বেদনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই ব্যথিত মন ইতিহাসের পথ বেয়ে ভারত ও চীনের মূল জীবনধাতুর স্বরূপকে আবিষ্কারের এবং দুই প্রাচীন বিশাল দেশের বহুশতাব্দীর পথ-বেয়ে-আসা বন্ধুত্বের আসল রূপটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে।

চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে।

ভারতের উত্তর সীমান্ত লঙ্ঘন করে চীনের সামরিক বাহিনী বারুদের ধোঁয়ায় কামান মর্টারের বিস্ফোরণ গর্জনে গুলীগোলার আঘাতে পঞ্চশীল এবং সহাবস্থানের নীতির স্বপ্নসৌধকে ধূলিকণায় পরিণত করে শূন্যলোকে উড়িয়ে দিয়েছে। স্তম্ভিত ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে আকাশ আবৃত করে ভাসতে থাকা সেই ধূসর ধূলিজালের দিকে। আঘাতও সে পেয়েছে। তার সীমান্তের ঘাঁটিগুলি ভেঙে পড়েছে, তার মুষ্টিমেয় সীমান্তবাহিনীর সৈন্যদলের অধিকাংশই তাদের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে যুদ্ধ করে জীবনপাত করেছে। তাদের বীরত্ব শৌর্য ও আত্মত্যাগের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা থাকবে। তাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে চীনের যান্ত্রিকবাহিনী রক্তাক্ত চক্রচিহ্ন রেখা আঁকতে আঁকতে ভারতের নিজস্ব ভূমির উপর এগিয়ে এসেছে। হিমালয়ের চিরশুভ্র তুষাররাশির উপর—গাঢ় লাল এই চাকার দাগ দিয়ে লিখছে সে তার নিজের বাণী। তার উপলব্ধির বাণী সে প্রমাণিত করে উল্লসিত।

"অবৈরিতার দ্বারা বৈরিতাকে রোধ করা যায় না। যায় নি।

অহিংসা একটি কল্পনা মাত্র, মিথ্যা। হিংসা বাস্তব—সুতরাং সত্য।

ক্ষুধা সত্য, লোভ সত্য, ক্ষুধা ও লোভ হিংসাকে করে জাগ্রত, হিংসা করে ক্রোধকে সক্রিয় ; সক্রিয় ক্রোধ আগুনের মত জ্বলে উঠে শক্তিতে ঘটায় বিস্ফোরণ। এই তো প্রকৃতির নিয়ম, সমগ্র পশুজগত এই সত্যে পরিচালিত। মানুষও পশু। বুদ্ধিমান পশু। সে এই সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির চাতুর্য মিশিয়েছে। মানুষের ইতিহাসে এই সত্য শুধু নির্মম নয়—সেখানে এ সত্য কুটিল ও জটিল।

সত্য অহিংসা অবৈরিতার কথা মিথ্যা কল্পনা। কল্পনাবিলাসী ভারতবর্ষ মিথ্যার উপাসক, মুর্খ।"

নবীন চীনের এইটাই জীবন সত্য। সে তো শুধু সমাজতন্ত্রবাদী নয়—সে তার সঙ্গে সমরতন্ত্রবাদী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগ তার অপরিহার্য। তার প্রতীক গাঢ় রক্তবর্ণ ; মাটি রক্তাক্ত না হলে তার উপর তার তন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। এই তার কাছে সুমহত্তম ন্যায় ও নীতি। এমন কি পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথেও তার ন্যায়ে যুদ্ধের প্রয়োজন। শান্তির সঙ্গীত আক্রোশের রাগিণীতে সে গেয়ে থাকে। অস্ত্রের ঝনৎকার তার সঙ্গে বাদ্যসঙ্গীত রচনা করে।

এই যার জীবনসত্য—স্বাভাবিকভাবেই হিংসা ও বৈরিতাই তার জীবনের ধাতু। নবীন চীনেরও তাই। হিংসা ও বৈরিতার ধাতুতেই গঠিত তার প্রকৃতি ও চরিত্র। এই প্রকৃতির নিষ্ঠুর নির্দেশে নূতন চীন জন্মলাভের পরই তার আদর্শে অবিশ্বাসী বা আদর্শবিরোধী লক্ষ লক্ষ নরনারীকে হত্যা করেছে। সে হত্যা সে রক্তপাত আজও অব্যাহত। এই তো কয়েক বৎসর পূর্বে Let hundred flowers blossom—এই ছলনাময় ঘোষণা করে হাজার হাজার অম্লান ফুলের সন্ধান জেনে নিয়ে তাদের দ্বিধাহীন চিত্তে নির্মূল করে দিলে। তার পরও নিজেদের কাজ চলছে। চলেছে। প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে চীন ভারতবর্ষ থেকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ভগবান বুদ্ধের বাণী ও ধর্ম। মহাত্মা কনফুসিয়াস পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। নূতন চীন এই অব্যাহত রক্তস্রোত দিয়ে মুছে দিয়েছে বুদ্ধের ধর্ম ও বাণীকে, কনফুসিয়াসের জ্ঞানকে। এ ইতিহাস। এই ইতিহাসই প্রমাণ করে যে, নূতন চীনের জীবনধাতু হিংসা, বৈরিতা। মনেপ্রাণে সে সমরতন্ত্রবাদী। সমরতন্ত্রবাদের প্রকৃতি-পরিণতি বিস্তারে পররাজ্য গ্রাসে। জীবনের তৃপ্তি আনন্দ ও উল্লাস তার যুদ্ধের উত্তেজনায়। যুদ্ধের প্রেরণায় যে জাতির নায়কেরা সাধারণ মানুষকে সমরলোলুপ

করে গড়ে তোলে সে জাতি বাহিরে যুদ্ধ না পেলে ঘরে যুদ্ধ বাধায়। শেষ পর্যন্ত নায়কেরা তার তিক্ত ফল ভোগ করে। তাদেরই তারা হত্যা করে। সুতরাং যুদ্ধ তাদের দিতেই হয়। যুদ্ধ তাদের অপরিহার্য। নবীন চীনের অভ্যুদয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চৌদ্দ বছরের ইতিহাসে এই প্রকৃতির তাড়নায় সে অর্ধেক কোরিয়া গ্রাস করেছে। তিব্বতকে উদরস্থ করেছে। এবং মানবজাতির মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতার ভূমিকায় নিজেকে নিজেই অধিষ্ঠিত করে প্রশান্ত সাগরের সারা উপকূলে যুদ্ধ বিস্তারের চেষ্টা করেছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও অপ্রত্যক্ষভাবে। এ তার holy war—ধর্ম যুদ্ধ। চীনের সর্বাধিনায়ক মাও সে-তুং নিজে বলেছেন—

The life of mankind is made up of three major eras—the era of peace, the era of war and another era of peace. We are now at the junction between the second and the third eras. The era of war will be ended with our hand. If we do not hoist the banner of revolutionary war a greater part of the human race will face extinction.

শেষে বলছেন—

the most honoured career to save mankind from destruction.

সমরতন্ত্রবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়ে গঠিত চীনের আদর্শ ও জীবন-ধাতু এরই মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। এই আদর্শে সারা দেশে নিত্য প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পঁচিশ কোটি যুবক-যুবতী সামরিক পদ্ধতিতে কুচকাওয়াজ করে থাকে। এ আমি চীন ভ্রমণের সময় স্বচক্ষে দেখে এসেছি। স্বকর্ণে শুনে এসেছি—তার আদর্শের সঙ্গে যে-দেশের আদর্শের একাত্মতা নেই আনুগত্য নেই তাদের উপর কি আক্রোশ তাদের! সেইসব স্লোগানে চীনের আকাশবাতাস মুখর হয়ে থাকে। এর

স্বাভাবিক পরিণাম বা পথ যুদ্ধ ও যুদ্ধের পথ। চীনের নায়কবৃন্দের তার দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধ দিতেই হবে। প্রতিশ্রুতি সবার সঙ্গে ভাঙা চলে—ভাঙা চলে না শুধু নিজের সৃষ্টির সঙ্গে। সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী ফল—স্রষ্টার ধ্বংস। ১৯৫৮ সালে কুয়েময়ে এই যুদ্ধ চীনের নায়কেরা দিতে চেয়েছিলেন—ফরমোজার অধিবাসী চীনাদের স্বর্গীয় ফলের আস্বাদ দেবার জন্য। কিন্তু সেখানে আমেরিকার নৌবহর উপস্থিত ছিল। তারা উত্তর দিয়েছিল—একটি কামান গর্জনের উত্তরে দুটি কামান গর্জনের দ্বারা। চীনকে হাত গুটিয়ে সরতে হয়েছিল। ব্যর্থতার রোষ তাকে করেছিল উন্মত্ত। সেই উন্মত্ততায় সে ভারতবর্ষকে ভাবলে সহজ শিকার। ভারতবর্ষ অহিংসাবাদে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষ মূর্খ। ভারতবর্ষ সমরচর্চা করে না তার মত, সুতরাং সে দুর্বল। পৃথিবীতে সে কোন সামরিকজোটে যোগ দেয় নি, সুতরাং সে বন্ধুহীন। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে তার আদর্শে বিশ্বাসী ভারত-ধর্মদ্রোহী একটি শক্তিশালী দল আছে সুতরাং এখানে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। সে স্বপ্ন দেখেছিল—পশ্চিমে আরব সাগর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ভূখণ্ড লাল হয়ে গেছে। রক্তপতাকা উড়ছে।

তার ভুল হয়েছিল মূলে। ভারতবর্ষের জীবনধাতুর শক্তি ও স্বরূপ সে নির্ণয় করতে পারেনি। ভারতবর্ষের জীবনধাতুর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ধরা যায় না অথচ যার অস্তিত্বকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। যা কালের ক্ষয়ে ক্ষয়িত হয় না, জীর্ণ হয় না, যার বিচিত্র গুণ এই যে, কঠিনতম আঘাত মাত্রেই মুহূর্তে সঞ্জীবিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বিগত তিন থেকে পাঁচ হাজার বৎসরকালের মধ্যে দশ-পনেরটি সভ্যতা ও জীবনধর্ম নিঃশেষে লুপ্ত হয়েছে। সে সব সভ্যতা ও জীবনধর্মের নিদর্শন আজ প্রত্নতত্ত্বের বস্তু ; গবেষণার বিষয়।

সে সব সভ্যতার অবশিষ্ট বলতে তার মৃত্তিকার স্তর চাপাপড়া

ইট-কাঠ-পাথরের নিদর্শন এবং ইতিহাসের পাতায় প্রাচীন তথ্য। মিশরের মামির মত। প্রাণহীন শব। কিন্তু ভারতবর্ষে তার এই বিচিত্র সভ্যতা ও সাধনার ধারা আজও অব্যাহত; তারও অনেক ইট-কাঠ-পাথরের নিদর্শন মাটির গর্ভে চলে গেছে কিন্তু বিচিত্র এই প্রাণশক্তি মহাকালের হাতের চাপা দেওয়া এই মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে উপরে উঠে বেঁচে আছে। কাল তাকে বারবার জীর্ণ করেছে, বৃদ্ধত্ব এসেছে তার কিন্তু বারবারই সে প্রাণধারা জরার নির্মোক পরিত্যাগ করে নবীনতায় সঞ্জীবিত হয়েছে। কতবার আঘাত এসেছে বহিরাগত জাতির অভিযানের মধ্যে। সে আঘাতে মুহ্যমান হয়েছে কিন্তু আবার সে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে বহিরাগতের শক্তির অমৃতটুকু গ্রাস করে অভিযানকারী বহিরাগতকে দামোদরের মত গ্রাস করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তার বারবারের নবপ্রকাশ এক-একটি মহাপ্রকাশ। পৌরাণিক ভারতবর্ষের জরার নির্মোক ত্যাগ করে ঐতিহাসিক ভারতবর্ষরূপে নবপ্রকাশ পরম বুদ্ধের মহা-প্রকাশের মধ্যে। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সম্রাট ধর্মাশোকের সময় ভারত-মহিমায় অর্ধেক পৃথিবী মুগ্ধ হয়ে ভারতভূমিকে পরম তীর্থ বলে প্রণত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি হতে হতে আচার্য শঙ্করের অভ্যুদয়ে ভারত-ধর্মের আবার নবসঞ্জীবন। এইভাবেই বার বার সে আপনার অমৃতবলেই নবকলেবরে ও জীবনে সঞ্জীবিত হয়েছে। বারবার এসেছে বাইরে থেকে অভিযান, ভীমখড়্গের আঘাত সে সহ্য করেছে। অধিকাংশ আঘাতই পিছন দিক থেকে অতর্কিত আঘাত। মুহ্যমান হয়েছে সে, হতচেতন হয়েছে। বারবার তাকে মৃত বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সে মরেনি। এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, তার যুদ্ধনীতির মধ্যে কখনও সে তার জীবনাদর্শবিরোধী কুটিল অধর্ম যুদ্ধ প্রশ্রয় পায়নি। তার দীর্ঘ আটশো বছরের যে ইতিহাসে সে বহিরাগত অভিযানকারী ও তাদের জীবন-ধর্মের সঙ্গে সংগ্রাম ও সমন্বয় করেছে তার মধ্যে ভারতবর্ষের জীবনধর্মের এই বিস্ময়কর প্রবণতা ক্ষীণ হলেও

হীনবল হয়নি। দীর্ঘকাল পর উনবিংশ শতাব্দীতে সে জীবনধর্ম নূতন করে নির্মোক ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। ইউরোপের ভোগবাদ ও বস্তুবাদকে গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্মিক শক্তিই প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল—প্রকৃতিনিয়মকে লঙ্ঘন করে। এই কালের যে মহাপ্রকাশ যাকে দেখে মনে হয় এ ভারতবর্ষ অতীতের ভারতবর্ষ ও তার সেই আদর্শের বিরোধী বা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তাকে বলব এই ভারতের ধর্ম ও আত্মার প্রতীক সন্ধান করে দেখতে। আমাদের পুরাণে আছে স্রষ্টা চতুর্মুখ। চারটি মুখ আমার চোখের সামনেও ভেসে ওঠে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাণীমুখ, মহাত্মা গান্ধী ভারতের ধ্যান মুখ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের শৌর্য মুখ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল ভারতের কর্ম মুখ। চারটি মুখের ললাটই ত্যাগের তিলকচিহ্নে উজ্জ্বল। প্রত্যেকের কাছেই সত্যের দ্বারা মিথ্যা পরাভূত ; হিংসা মিথ্যা, প্রেম সত্য। মৃত্যু পরাভূত অমৃত করায়ত্ত। প্রতিষ্ঠা রাজাসনে নয় মানুষের মনোসিংহাসনে। সর্বশেষ—সত্য প্রেম অমৃত কর্ম সমস্ত কিছুর একমাত্র আধার মানবধর্ম।

এই ধর্মকে আশ্রয় করে ১৯৪৭ সালে যে নবীন ভারতবর্ষের অভ্যুদয় হয়েছে তার পতাকার প্রতীক ধর্মচক্র ; তার আদর্শ বিশ্ব-মৈত্রী তার নীতি অহিংসা এবং তার শীল পঞ্চশীল।

তার স্বপ্ন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে মানবচিত্ত এবং হৃদয়-শুদ্ধির সংগঠনে বা তপস্যায় এক শান্তিপূর্ণ অমৃতসন্ধানী জগৎসংসার। এই কারণেই তার নবঅভ্যুদয়ের পর সামরিক সংগঠনের দিকে ভারত ব্যগ্র হয়নি। তার মনের এই গঠনের জন্যই সেদিকে ব্যগ্র হওয়া অসম্ভব ছিল। নূতন ভারতবর্ষ স্বাভাবিক প্রেরণায় সকল উদ্যম নিয়োগ করেছিল—অন্নের উৎপাদনে, বস্ত্রের সংস্থানে, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থায়। অন্নে-বস্ত্রে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে ও মানবধর্মের তপস্যায় মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করাই ছিল লক্ষ্য। অস্ত্র উৎপাদন সে করেনি, সকল জাতিকে সে বিশ্বাস করেছিল। মনের এই গঠনের জন্যেই ১৯৪৯

সালে আজকের আক্রমণকারী এই নূতন চীনের জন্মলগ্নে ভারতবর্ষ তাকে অভিনন্দিত করে বলেছিল —জয়তু মহাচীন ! নূতন অভ্যুদয়ে তুমি ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন গ্রহণ কর।

পাকিস্তান তার জ্ঞাতিশত্রু। তার সঙ্গে বিবাদ সে কোনদিন করেনি বা চায়নি। কিন্তু তাতে কি হবে ? দুটি বিপরীতধর্মী শক্তির সম্মেলনে বা সংমিশ্রণে যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। এ সংঘর্ষ অনিবার্যই ছিল, এ দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কেরা যে না বুঝেছিলেন তা নয় ; বুঝেও বোধ হয় বিশ্বাস করতে চাননি বলার চেয়ে সৎ ও শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস রাখতে চেয়েছিলেন। সংসারে অবিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল এই পরমবুদ্ধিকেই বড় করে তুলেছিলেন। সীমান্ত নিয়ে বিরোধের প্রশ্নটি প্রথম চীননায়ক তোলেন বোধ করি ১৯৫৬ সালে। আলোচনা পত্রবিনিময় করতে করতে তাঁরা তাঁদের সমরবাদী নীতি অনুযায়ী হিমালয়ের উপরে সামরিক আয়াজন সম্পূর্ণ করে তুললেন। আলোচনায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে তো তাঁদের বিশ্বাস থাকতে পারে না, নেই। তা ছাড়া প্রশ্নটি তো শুধু সীমান্তের নয়, সমস্ত কিছুর মূলে আছে তাঁদের সেই বিচিত্র কল্পনা—বন্দুকের নলের মুখে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার। আফ্রিকা এশিয়ার স্বয়ংনিযুক্ত মুক্তিদাতা চীন ঘোষণা করেছে : "The era of war will be ended with our hands.... If we do not hoist the banner of revolutionary war a greater part of the human race will face extinction."

এবং ভারতবর্ষে এই মহাবিপ্লব যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য একদল দেশধর্মে অবিশ্বাসী চীনধর্মে দীক্ষিত শিক্ষিত মানুষ চেষ্টা তো আজ থেকে করছে না, অনেককাল থেকে করছে। এ সত্য প্রমাণিত। সাহিত্যে, শিল্পে, নানান সংগঠনে এর প্রমাণ রয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে একটি কবিতা পড়েছিলাম। তার শেষ হয়েছিল এই কথায় :

"ভেবেছ কি হে ভেবেছ কি ?
দেখছ কি ?
আসছে বছর নবেম্বরে
বাংলায় গড়ব লাল ফৌজ
বাংলাকে বানাবো লালচীন—।"

হয়তো কথার দু-একটা উল্টোপাল্টা হয়েছে কিন্তু কথাটা এই। ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে এর ক্ষেত্র প্রস্তুতের চেষ্টা হয়েছে। শান্তি শিবির ও শান্তি সম্মেলনের নামে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রচারে রচনায় এর প্রস্তুতি হয়েছে। সবের পিছনে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি।

ভারতবর্ষের মানুষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষণে পেষণে মৃতপ্রায় শুষ্ক দাহ্য পদার্থের মত, রাষ্ট্র অস্ত্রহীন নিষ্ক্রিয়, চীন মুক্তিধ্বজাবাহী আগুন। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তাঁদের সহযাত্রীবৃন্দ অনুকূল বাতাস এই চারটি অঙ্ককে যোগ করে অঙ্ক কষে এই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চীন। ১৯৫৯ সালে চীনের প্রত্যক্ষ আক্রমণের পরও একে সামান্য সীমান্ত সঙ্ঘর্ষ বলে চীনকে শেষ বিশ্বাস করেছে। এই বিরাট অধ্যায়ে ভারতবর্ষ ন্যায়ের দিক থেকে নীতির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে গ্লানিমুক্ত। কিন্তু বুদ্ধির দিক থেকে, বিচারের দিক থেকে, আপনার প্রতি কর্ত্তব্যের দিক থেকে সে নিশ্চিতরূপে অপরাধ করেছে। এবং চীনের সঙ্গে সম-বিশ্বাসী—বলব—একধর্মী এবং তাদের সহযাত্রী তথাকথিত প্রগতিবাদী দলের কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়াও কম অপরাধ নয়।

আরও কিছু কিছু অপরাধ আছে। উদ্যোগে শৈথিল্যের অপরাধের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে এখন থাক। মধ্যে মধ্যে আজ মনে সন্দেহ হচ্ছে—হয়তো অপরাধ হয়নি। এক মহান সত্যের গৌরব সে ত্রুটিকে নূতন এক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত করছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী সেদিন মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন—"ভারতবর্ষ যে ষোল বৎসরের স্বাধীনতার মধ্যে সমরাস্ত্র নির্মাণ করেনি, তার অহিংসা-বিশ্বাস বাক্যের সঙ্গে

বাস্তবকর্মে পালন করেছে সকল বিপদাশঙ্কাকে বরণ করে, এ-সত্য আজ সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।" এরই জন্য সমগ্র বিশ্বের এক মুহূর্তে চিনে নিতে বিলম্ব হয় নি আক্রমণকারী কে? এরই জন্য সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই অকুণ্ঠ সাহায্যদানে সম্ভ্রমের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে। আজ অস্ত্র আসছে এবং আসবে—সম্ভারে সম্ভারে।

সকলের থেকে বড় বিস্ময় ভারতবর্ষ নিজে। স্বাধীন ভারতবর্ষের এই ষোল বৎসরের বহিরঙ্গের পরিচয় রাষ্ট্রনায়ক থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে চিন্তার এমনকি উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে উঠেছিল। নগরে নগরে সমাজে বিশেষ করে যুবক জীবনে যে উদগ্র বিলাস লালসা এবং সম্ভোগ তৃষ্ণা প্রকট হয়ে উঠেছে, সকল প্রকার নীতি ও ন্যায়ের প্রতি যে বিতৃষ্ণা ও বিমুখতা দেখা গিয়েছে—যার প্রতিচ্ছবিতে আজকের সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প (যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত) প্রতিফলিত হয়েছে—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ২০শে অক্টোবর চীন ব্যাপকভাবে আক্রমণ করলে ভারত সীমান্ত। কয়েকদিনের মধ্যে সমগ্র দেশ বিচিত্র রূপান্তরে রূপ গ্রহণ করলে। বিলাস, উল্লাস, বিশ্বাসহীনতার উচ্ছৃঙ্খল পদক্ষেপ, কামনা-উদগ্র দৃষ্টি, সব পাল্টে গেল। দেখতে দেখতে জাগল নূতনের মধ্যে সনাতন ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষ আছে বিশ্বকবির কাব্যে, যে ভারতবর্ষ আছে মহাত্মাজীর ধ্যানে তপস্যায়, যে ভারতবর্ষ আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংগঠনে।

চীন থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

তার সম্মুখে, দেশদ্রোহীর নেতৃত্ব চালিত বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ কোথায়? এ কোন্ ভারতবর্ষ। এ সনাতন ভারতবর্ষ!

দুই

পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি যে ভৌগোলিক প্রাকৃতিক প্রভৃতি কারণে এক এক দেশের পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এক এক ধরনের বিচিত্র প্রকৃতি পেয়ে থাকে। শুধু প্রকৃতিই নয় তাদের আকৃতির মধ্যেও এর ছাপ থাকে। এবং বহু হাজার বছরের মধ্যে সভ্যতার যে বিবর্তন হয় তার ধারাও অন্য দেশের ধারা থেকে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ধর্মী। একে আমি 'জীবনধাতু' বলেছি। চীনের জীবন-ধাতু বলেছি সমরধর্মী। যেসব কারণের কথা উল্লেখ করলাম সেই সব কারণেই চীন দেশে যে মানুষেরা জন্মেছে, যে সমাজ গড়েছে এতকালের (এই কাল সুদীর্ঘ এবং আমাদের দেশের মতই প্রাচীন প্রায়) বিবর্তন সত্ত্বেও সে মানুষেরা এবং সেই সমাজ তাদের জীবন-ধাতু থেকে উৎপন্ন প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে পারেনি বা পারলে না। চীনের ভৌগোলিক সীমানা বিপুলায়তন। এই ভূখণ্ড আবার মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া চীন প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত—চীন আবার অনেক ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত। এর মধ্যে যারা বাস করে তারা বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন আচার সত্ত্বেও প্রকৃতি ও আকৃতিতে এক। পীত জাতি বা মঙ্গোলিয়ান নরবংশের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম যুগে সে খৃষ্টপূর্ব তিনি হাজার বছরের পূর্বে, সভ্যতার প্রারম্ভে নানান উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এবং তখন এই ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যেই পরস্পরের সঙ্গে চরম নিষ্ঠুরতার ও আরণ্য কুটিলতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। প্রথম সম্রাট ফু-শি (খৃঃ পূর্বাব্দ ২৮৫২)র নাম শোনা যায়। তাঁর পর খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'হান' বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। হান বংশীয় সম্রাট wuti-র সময় প্রথম চীনের অধিবাসীদের জীবনতৃষ্ণা, আত্মকলহ ও আত্মঘাত থেকে বাইরে—অর্থাৎ বাইরের দেশের সম্পদ ও অন্য মানুষের রক্তে পরিতৃপ্ত হবার পথ পেলে। বনের হিংস্র জন্তু জীবনধারণের এবং স্বভাবের তাগিদে বন্যজন্তু এবং স্বগোত্রীয়দের সঙ্গে হানাহানি ও রক্তপাত করতে করতে যখন বনের বাইরে এসে মানুষের

গ্রামে হানা দেয়, তখন সে বা তারা হয় নরখাদক এবং এই নরখাদকতার স্বাদ তৃপ্তি আলাদা। মানুষেরা যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এবং গোষ্ঠী থেকে একটি রাষ্ট্র গঠন করে জাতি হিসাবে অপর জাতির উপর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালায়—তখন তাদের জাতিগত ঐক্য দৃঢ় হয় এবং উন্মাদ হয়ে ওঠে। তবে ধাতুগতভাবে যারা হিংস্র ও আমিষভোজী জন্তু তারা ছাড়া যেমন নর-খাদকতার নেশা অন্য জন্তুর পক্ষে সম্ভবপর নয়—তেমনি যেসব মানুষ বা জাতির জীবন-ধাতুতে এই হিংসা ও রক্তের নেশা নেই তাদের পক্ষেও এই ধরনের জাতীয়তা বা স্বভাবধর্ম গঠন সম্ভবপর নয়। চীনের মধ্যে এটা ছিল এবং সেই কারণেই যে মুহূর্তে বিভিন্ন উপজাতি একজন শক্তিমান নায়কের অধীনে যখনই ঐক্যবদ্ধ হল সেই মুহূর্তেই তারা পঙ্গপালের মত বা দলবদ্ধ নেকড়ের মত ছুটে বের হল পার্শ্ববর্তী দেশদেশান্তরে। তার উপর সেই যুগ—নিষ্ঠুর হত্যা অগ্নিদাহ লুণ্ঠন ব্যভিচার, পাশবিকতার সবকিছুকেই তারা চরম করে ছেড়ে দিলে। এই সময় তুর্কীদের উপর নিষ্ঠুরতম অত্যাচার করেছে তারা। এবং পূর্বতুর্কীস্থান দখল করে সাম্রাজ্য বিস্তারের বিচিত্র স্বাদ অনুভব করে। চীনের এই অধ্যায় প্রায় চারশো বৎসরকাল স্থায়ী। ২২০ খৃষ্টাব্দে হান বংশের পতন হয়। আজও পর্যন্ত—অন্তত চল্লিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত চীনের মানুষ হান বংশের সঙ্গে রক্তের যোগ কল্পনা করেছে, আনন্দ অনুভব করেছে, গৌরব অনুভব করেছে। হান বংশের পতনের পর চীন বাইরে আক্রমণ চালায়নি—কিন্তু যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়নি। গৃহযুদ্ধে রক্তের স্বাদ গ্রহণ করে তার রক্ত ও যুদ্ধলোলুপতাকে সঞ্জীবিত রেখেছে। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর তাঙ (Tang) বংশের প্রতিষ্ঠা হল। এরপর প্রায় চারশো বছর ধরে আবার সেই অভিযান-ধর্ম সঞ্জীবিত হল। পরদেশ আক্রমণ যুদ্ধ হত্যা লুণ্ঠন অগ্নিদাহ ব্যভিচার। এবং তার মধ্যেই জীবনের আকাজ্ক্ষার পরিপূরণ। আমরা জীবনে সেই প্রথম থেকে, ঐতিহাসিক গণনায় যা প্রায় পাঁচ হাজার বছর, এই পাঁচ হাজার

বছর ধরে চেয়ে এসেছি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। এই আমাদের চতুর্বর্গ। চীনের চতুর্বর্গ যুদ্ধ হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ! তাঙ (Tang) বংশের অধীনে প্রায় চারশো বা তিনশো বছর ধরে এ চতুর্বর্গে বিপুল পরিতৃপ্তি লাভ করে এই ধর্মের দানবিকতায় সার্থকতা অর্জন করেছে। এই সময়ের মধ্যে চীন সাম্রাজ্যবাদ—একদিকে পূর্ব পারস্য কাস্পিয়ান সমুদ্র এবং উত্তর পূর্বে কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করে যে হুঙ্কার ছেড়েছে—তাতে তার পীত দেহবর্ণের ছায়া পৃথিবীর আকাশে মহা আতঙ্কের ছায়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে পীতাতঙ্কের শুরু তখন থেকে।

এরপর সুঙ বংশ—তারপর ইতিহাসের মহা আতঙ্ক মোংগল বংশ। চেঙ্গিস খাঁ চীনের সম্রাট হলেন। চেঙ্গিস খানের পর কুবলাই খান। কুবলাই খান নিষ্ঠুর বর্বরতা এবং পাশবিকতার সঙ্গে মহামারী বা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মত চীনের শক্তিকে চালিত করে উত্তরে—উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে তিব্বত ও হিমালয়ের উত্তর-পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পূর্ব-দক্ষিণে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত রক্তপাতে অগ্নিদাহে লুণ্ঠনে ধর্ষণে বিধ্বস্ত করে দিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করলেন।

চেঙ্গিস খান ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। কুবলাই খাঁ কিন্তু ভারতবর্ষে ঢুকতে সাহস করেননি। অন্যথায় চীন আজ বা পূর্বেও কোন সময় হয়তো দাবি করে বসত যে, যেহেতু ভারতবর্ষ একদা তার সাম্রাজ্য ছিল সেহেতু এ বিশাল ভূখণ্ডের উপর অধিকার তার। বার্মা এবং আরও কয়েকটি পূর্ব দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এ দাবি সে করেছে আগে, অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে। এ ঐতিহাসিক সত্য। ভবিষ্যতে আবারও সে তা করবে কিনা সেটা তার এই ভারত আক্রমণের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। থাক। তার আগে চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা বলা প্রয়োজন।

* * *

খৃষ্টপূর্ব অব্দ থেকেই চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। তিব্বতের মধ্য দিয়ে সে ভারতবর্ষে তার পণ্য নিয়ে আসত এবং এখান থেকে কেনাকাটা করে নিয়ে যেত। কি আনত কি কিনত, তারা বেশী আসত, না, ভারতের লোকে বেশী যেত এ আমি ঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত জাহাজপথেও লেনদেন চলত। তখন ভারত মহাসাগরে ভারতের অর্ণবপোত সগৌরবে বিচরণ করত। যবদ্বীপ সুমাত্রা বলীদ্বীপ শ্যাম প্রভৃতি রাজ্যের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবের নিদর্শন বহু মন্দিরে আজও বিদ্যমান। তাদের গায়ে ভারতীয় অর্ণবপোতের ছবি উৎকীর্ণ রয়েছে। চীন থেকে যে-সব জিনিস এসেছে, তার মধ্যে চীনাংশুক কথাটা আজও রয়েছে। কিন্তু সে লেনদেনটা বড় কিছু নয়। তা দিয়ে কোন ঐতিহাসিক সূত্র রচিত হয়নি। বাণিজ্যসূত্রে পরিচয়ের কোন কিছুই ইতিহাসে বা পুরাণে মেলে না। প্রাচীন চীন সাহিত্যে দুটি কিংবদন্তী আছে। একটি হল—সম্রাট অশোক চীনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা বিদেশী বলে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। পরে মুক্তি পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে একজন চীন সেনাপতি হুনদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফেরার পথে একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি নিয়ে গিয়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি পত্তন করেন। কিন্তু এ কিংবদন্তী মাত্র। ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই। ইতিহাসে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষের কুশান রাজারা চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠান এবং তার সঙ্গে উপহার পাঠান বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পুঁথি। এই পুঁথি পাঠ করে এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের কাছে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে একজন বা কয়েকজন চীনা পণ্ডিত নিঃসংশয় হয়ে চীন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে প্রমাণ করেন যে, চীনদেশে তৎকালে প্রচলিত ধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং নিঃসংশয়ে পরম জীবনের সন্ধান দেয় এই ধর্ম। চীনদেশের মানুষের যে জীবনধাতুর কথা বলেছি, সে যেমন দেশ প্রকৃতি ও পরিমণ্ডলের কোন অনির্ণীত কারণে এবং সভ্যতার সূত্রপাতের ধারার গতি-প্রকৃতি বশে

হিংসায় রক্তপাতে উল্লাস অনুভব করে, গৌরব বোধ করে, তৃপ্তি পায় ; তার দেহকোষের উল্লাস ও পরিতৃপ্তি এতেই যেমন স্বাভাবিক—তেমনি স্বাভাবিক তার মনের তৃষ্ণা। যে মন, ভিন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবী জুড়ে—একটি পরম তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত—সকল দেহধারীর অন্নক্ষুধার মত। পরিষ্কার করে বলি—পৃথিবীর সকল বা প্রত্যেকটি দেহধারী জীবই যেমন অন্নক্ষুধা অনুভব না করে পারে না তেমনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মন একটি বিচিত্র পরম-তৃষ্ণা বা শান্তি-তৃষ্ণা অনুভব না করে পারে না। জীবনগত ধাতু যেটি—সে বহু সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়। পরম তৃষ্ণা এরই অভ্যন্তরে নিহিত থাকে। কোথাও নিষ্পেষিত হয়ে নিরূপায় চেতনাহীনতায় পঙ্গু হয়ে পড়ে। কোথাও তার সহজ স্বচ্ছন্দ স্ফুরণ হয় এবং কোথাও বা এই তৃষ্ণার অতিস্ফুরণ বা অতি-প্রকাশে দেহগত ক্ষুধা দুর্বল হয়ে পড়ে।

মধ্যে মধ্যে এই তৃষ্ণা স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিকেও উতলা করে, জাতিকেও পীড়িত করে তোলে। দেহ-ক্ষুধার বেলাতেও তাই। যাক। চীনের এই নিষ্পেষিত বা অবরুদ্ধ মানস-তৃষ্ণা বৌদ্ধধর্মের শান্তির বাণীতে আকৃষ্ট হল বৌদ্ধধর্মের প্রতি। তার প্রেরণায় কিছু কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি সে সময় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এর পর খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে চীনের সম্রাট আকৃষ্ট হন বৌদ্ধধর্মের প্রতি। তাঁর নিমন্ত্রণে কুশানদের অঞ্চল থেকে কশ্যপমাতঙ্গ, ধর্মরত্ন নামক দুজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং শাস্ত্রজ্ঞ, এক শ্বেতবর্ণ অশ্ববাহিনীর পিঠে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের পুঁথি চাপিয়ে এসে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হন। সম্রাট তাঁদের সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং এক মঠ তৈরি করিয়ে সেই মঠে এই বৌদ্ধ-ধর্মশাস্ত্রগুলি রক্ষা করেন। এই মঠ বা বিহারের নাম দেন—শ্বেতাশ্ব বিহার বা পো-মা-স। এই বিহার দীর্ঘকাল চীনের বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। এখানেই কাশ্যপ-মাতঙ্গ এবং ধর্মরত্নের তত্ত্বাবধানে চীনা ভাষায় এই সব ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ হয়।

বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব চীনদেশের জীবনধাতুগত ও এযাবৎ তাদের

অনুশীলনগত সমরতান্ত্রিকতা, সাম্রাজ্যবিস্তার ও লুণ্ঠনপিপাসার বিপরীত ও বিরোধী। সুতরাং এক বিচিত্র সংঘর্ষ উপস্থিত হল চীনের জীবনে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেহ ধর্ম ও মনোধর্মের সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে মনোধর্মের জয় হয়; অনেক ক্ষেত্রে দুটির সংমিশ্রণে একটা মীমাংসা হয়; অনেক ক্ষেত্রে মন হেরে যায়। কিন্তু সমগ্র একটা জাতির ক্ষেত্রে মনই হারে।

প্রথম প্রথম চীন দেশের এই কামনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে সম্প্রসারিত হয়েছেঃ পারস্য মধ্য-এশিয়াতেও গেছে। সিংহল ব্রহ্মদেশ দ্বীপময় ভারত সর্বত্র মানুষ শান্তির তৃষ্ণায় পরমাগ্রহে এই ধর্মকে গ্রহণ করেছে। নানান দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা চীন দেশে গেছেন এবং প্রবল আগ্রহকে প্রবলতর করে তুলেছেন। অন্য দিকে চীনদেশ থেকে তৃষ্ণার্ত পণ্ডিতজন পরিব্রাজকের বেশে এদেশে এসেছেন। প্রথমেই ২৬০ খ্রীষ্টাব্দে একজন চীনা ভিক্ষু এদেশের মুখে রওনা হন—গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি ভারত দর্শনে। কিন্তু মধ্যপথেই তিনি কোন মঠে থেকে যান। প্রবাদ আছে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতে এসেছিলেন ব্রহ্মদেশ হয়ে—তাঁরা বুদ্ধগয়ায় এক বিহার নির্মাণও করেছিলেন। তারপর আসেন ইতিহাস-বিখ্যাত ফা-হায়েন। মরুভূমি অতিক্রম করে তাঁরা খোটান হয়ে, গিলগিট-কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ফা-হায়েন আসবার পথে আরও কয়েকজন চীনা পরিব্রাজকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, বেশ একটি পুষ্ট দল নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এবং দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন, বিভিন্ন বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে তাম্রলিপ্তি হয়ে সিংহলে যান। তাম্রলিপ্তিতে ফা-হায়েন দু বৎসর থেকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে সিংহল যান এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে দেশে ফিরে যান।

এর পর দলে দলে এসেছিল চীনা পরিব্রাজকেরা।

বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে এসেছে এবং মানুষের আগ্রহেরও সীমা ছিল না—এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য আবার চীনদেশের অভ্যন্তরে

চিরাচরিত যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, রাজ্যলোভ, হানাহানি। পূর্বে আমি যা বলেছি—তারই সত্যতা এই ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করে।

মনের তৃষ্ণার আকৃতি যেমন সত্য, তেমনি বা ততোধিক সত্য চীনের এই জীবন-ধাতু। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের প্রসারেও তার যুদ্ধ-তৃষ্ণা—হিংসার নিবৃত্তি হয়নি। সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্তি অবশ্যই হয় না, কিন্তু রক্ত-তৃষ্ণার অত্যধিক আগ্রহ, যা জাতিকে সমরতন্ত্রপরায়ণ করে তোলে, তার কি কিছু উপশম হয়েছিল চীনে? উত্তরে বলব হয়নি।

এই কালের মধ্যে চীনের পররাজ্য আক্রমণও বন্ধ ছিল না। স্তিমিত হয়েছিল তাদের সামরিক দুর্বলতার জন্য। তবুও তারা যখনই কিছুটা শক্তি অর্জন করেছে, সংগঠনের মধ্যে তখনই পররাজ্য আক্রমণ করেছে। অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং ভিক্ষু চীনে গিয়েছেন যুদ্ধবন্দী হিসাবে। এর মধ্যে কাশ্মীর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেই বেশী। আকশাই চীন লাডাক অঞ্চল দিয়ে কাশ্মীর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা তাদের সুদীর্ঘকালের লক্ষ্যস্থল। ওদিকে মধ্য এশিয়া ছিল অন্য লক্ষ্যস্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষার্ধে চীনারা মধ্য এশিয়ার কুচী রাজ্য আক্রমণ করে এবং এখান থেকে ভিক্ষু কুমারজীবকে বন্দী করে নিয়ে যায়। কুমারজীব কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, পিতা এবং মধ্য এশিয়ার কুচী রাজবংশোদ্ভূতা মাতার সন্তান। কুমারজীব ছিলেন মধ্য এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কুমারজীব আজীবনই চীনদেশে ছিলেন অতঃপর।

আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বৌদ্ধধর্ম চীনদেশের মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে কি বা কতটুকু দিয়েছিল—তার কথা বাদ দিয়ে জাতিগতভাবে চীনা জাতির ও চীনা রাষ্ট্রধর্মের মধ্যে কতটুকু পরিবর্তন আনতে পেরেছিল তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তখন বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েনসাং ভারতবর্ষে। মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতবর্ষে প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট। ভারতবর্ষের হিন্দুযুগের ইতিহাসে শ্রীমন হর্ষবর্ধন মহিমান্বিত পুরুষ। হুয়েনসাং

ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ছিলেন—তার মধ্যে বেশ কয়েক বৎসর মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজসভায় অবস্থান করেছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন হুয়েন সাঙের কাছে চীন সম্রাটের ও চীনবাসীর বৌদ্ধধর্মে আগ্রহের কথা জেনে তাঁর দিক থেকে দূত প্রেরণ করেন। প্রথানুযায়ী দূতের সঙ্গে উপঢৌকনও কিছু পাঠান। তার উত্তরে চীন সম্রাটও এক দূত পাঠান ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে। এ সম্পর্কে চীনা ঐতিহাসিক বা ঐ দৌত্য যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের একজন একটি বিবরণ রেখে গেছেন। তার মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে চীন সাম্রাজ্যের অধিনায়কদের মানসিক গঠন ও ভঙ্গী। ইংরেজী অনুবাদটি তুলে দিচ্ছি। এই চীনা দূতের বিবরণ—

"(In 641) Siladitya assumed the title of King of Magadha and sent an ambassador with a letter to the emperor (of China). The emperor in his turn, sent Lianghoai-King an envoy with royal patent to Siladitya with an invitation to him to submit (to the authority of the Chinese emperor). Siladitya was full of astonishment and asked his officers whether any Chinese envoy ever came to this country since time immemorial. "Never," they replied in one voice. Thereupon the King went out, received the imperial decree with bended knees, and placed it on his head."

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—

"No wonder that ordinary marks of courtesy and politeness, which Harsha showed to the ambassador, were represented as an act of submission. It is impossible to believe that Harsha could really expect any material aid from such a distant country as

China, of which he knew very little before he met Hiuen Tsang."

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পরও ধাতুগতভাবে সমরতন্ত্রবাদী চীনের বন্ধুত্ব স্থাপনের ভঙ্গী এমনি। তার ধারণা, তার অনুগত জন ছাড়া বন্ধু কেউ হতে পারে না। তার প্রতি আনুগত্য স্বীকৃতিই একমাত্র বন্ধুত্বের সংজ্ঞা তার কাছে।

শুধু এইটুকুই নয়—পরে এই ঘটনার আরও পরিণতি আছে। কিন্তু তার পূর্বে চীনদেশের যাঁরা পর্যটক এবং লেখক, তাঁরাও কি পরিমাণ উদ্ধত এবং অহংকৃত—যা তাঁদের লেখার মধ্যে, তাঁদের নিজেদের অহং তুষ্টির জন্য নিছক কল্পনা ও মিথ্যাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে—তার কিছু পরিচয় দিলে তাঁদের জাতীয় মনের ও ধারণার পরিচয় স্পষ্ট হবে। আমরা এদেশে হুয়েন সাঙের বিবরণের কথা অনেক শুনেছি। এবং এই পর্যটকটির প্রতি তাঁর বিবরণের জন্য কৃতজ্ঞতাও বোধ করি। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এ-আত্মম্ভরিতার পরিচয়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারেননি।

এই হুয়েন সাঙই তাঁর বিবরণের মধ্যে মহারাজ হর্ষের রাজসভায় থাকাকালীন তাঁর নিজের যে মহামহিমময়তার পরিচয় দিয়েছেন—তা এই। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন—"Still more striking is his (হুয়েন সাঙের) account of Harsha's religious assembly at Kanouj."

মহারাজ হর্ষের ইতিহাসখ্যাত ধর্মমহামণ্ডলের বিবরণের মধ্যে প্রথমে তাঁর সমারোহ এবং বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ও রাজন্যবর্গের সমাবেশের বিবরণের পর শোভাযাত্রার পটভূমিতে ধর্মবিচার ও আলোচনা-সভার কথা লিখেছেন হুয়েন সাঙ। এখানে মনে রাখতে হবে—ধর্মসভার অধিবেশন হচ্ছে ভারতবর্ষে কনৌজে। এবং পরম বুদ্ধের ও বেদ-উপনিষদকারদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাবেশের মধ্যে যিনি অধিনায়কত্ব করছেন—

তিনি চীনদেশের হুয়েন সাঙ। শ্রীযুক্ত মজুমদার সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে লিখছেন—

'It is needless to add that in this assembly for discussion. Hiuen Tsang is represented as towering head above the rest. The members of the assembly were selected by Harsha himself and included, in addition to the Kings and their two hundred ministers, 1000 renowned Buddhist priests and five hundred Brahmanas and followers of other religious sects. Hiuen Tsang was nominated as the Lord of the discussion, and having selected a subject, he offered his head to anyone who could find fault with his arguments None dared to challenge him for five days and then the followers of the Hinagana form of Buddhists plotted to kill him."

বলা বাহুল্য, মহারাজ হর্ষ—যিনি নাকি হুয়েন সাঙের মতে, উপলব্ধিতে তাঁর শিষ্য বা প্রায়-ভৃত্যে পরিণত হয়েছিলেন—তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করলে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হবে কেশস্পর্শকারী। এর পরও তিনি ক্ষান্ত হননি। নাটক করবার যে ভূমিকা তিনি রচনা করেছেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েননি।

এর পর ধর্মমহামণ্ডলের অধিবেশনের শেষ দিনে—মণ্ডপে আগুন লাগল এবং একজন শাণিত ছুরিকা বের করে মহারাজ হর্ষকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েও ব্যর্থ হল; সে ধৃত হল রক্ষীদের দ্বারা। এবং রাজার কাছে আনীত হয়ে প্রাণভয়ে অপরাধ স্বীকার করলে। স্বীকার করলে যে, সে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে এই কাজ করেছে। মহাপণ্ডিত (?) হুয়েন সাঙের প্রতি বিদ্বেষ ও ঈর্ষাবশতই ব্রাহ্মণরা

এই কার্যে উদ্যত হয়েছেন। মহামানব, মহা-মনীষী হুয়েন সাঙের প্রতি মহারাজের অনুগত্য, তারা সহ্য করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্মের প্রতি পক্ষপাতও অন্যতম কারণ। এর পর অবশ্যই প্রাণদণ্ড নির্বাসন হল ব্রাহ্মণদের।

শ্রীযুক্ত মজুমদার লিখেছেন—"The whole scene is dominated by the towering personality of Hiuen Tsang and Harsha cuts a sorry, almost a pitiable figure....It was again queer indeed to convoke an assembly for religious discussion with Hiuen Tsang as the chief spokesman, and then to declare publicly that whoever speaks against him shall have his tongue cut.

এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই বিখ্যাত পরিব্রাজকটি তীর্থ (গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি) দর্শনে এবং এদেশের ভাষায় লিখিত ধর্মের মর্ম অনুধাবন করতে এসেও জাতিগত চরিত্রের দম্ভ ও ঔদ্ধত্যকে বিস্মৃত হতে পারেননি। সে অহংকার ও ঔদ্ধত্য এমন যে, সৌজন্যবশত কৃত নমস্কারকে প্রণাম ভেবেছেন, বিদেশী বলে দেওয়া সম্মানের আসনকে গুরুর আসন ভেবে সেই মনোভাব নিয়ে বসেছেন তাতে। বন্ধুত্বের দৌত্য প্রেরণের ভাষাই হল যাদের "রাজকর প্রদান করে আনুগত্য স্বীকার কর"—তাদের দেশের পণ্ডিত-জনেরও মন এবং দৃষ্টি কি হতে পারে? অথবা যে দেশের পণ্ডিত ও পরিব্রাজকের এই দৃষ্টি এই মনোভাব, সে-দেশের রাজতন্ত্রের এই মনোভাব ছাড়া আর কোন্ মনোভাব হতে পারে? অথবা যে জাতি জীবনধাতু অনুযায়ী জগৎ ও জীবনের প্রতি উদ্ধত রক্তচক্ষে দৃষ্টিপাত করে, তাদের রাজা এবং পণ্ডিতদের এমন অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন্ অভিব্যক্তি হতে পারে।

এইখানেই এই পর্বের পরিসমাপ্তি নয়; এর পর মহারাজ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সেই অতীত কালে স্বদেশ থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে থেকেও

চীনদেশের রাজদূত কুটিল চক্রান্তজাল ফেলে উন্মত্ত সমরতান্ত্রিকর্তার প্রেরণায় যে তাদের চরিত্রগত দুঃসাহসিক বিপ্লব ও যুদ্ধের চেষ্টা করেছিলেন তার গুরুত্ব বাস্তবের ক্ষেত্রে অল্প হলেও ব্যক্ত করে এই সমরতন্ত্রবাদী জাতির হিংস্রকুটিল স্বরূপ।

তিন

এর আগের অধ্যায়ের শেষে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ে চীন দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের কথা বলেছি। এবং বলেছি যে সম্রাট হর্ষবর্ধনের তিরোভাবের পর এঁরা একটি অভিযান আনবার চেষ্টা করেছিলেন ও এনেছিলেন। এই রাষ্ট্রদূতের নাম—ওয়াং হিউয়েন সি। তাঁর নেতৃত্বে যে অভিযান তিনি এনেছিলেন তারও চৈনিক বিবরণ তাঁরা রেখে গেছেন। এই বিবরণ রাখার ব্যাপারে চীনদেশের অসাধারণ কৃতিত্ব। এ কথা আমি শ্লেষ বা ব্যঙ্গ পরিহার করেই বলছি। এবং শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গেই বলছি। বিশ্ববিখ্যাত হিউয়েন সাঙের বিবরণ ভারতবর্ষের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। শুধু আত্মপ্রচার ও স্বজাতি গৌরব সম্পর্কে যে অবিশ্বাস্য অতিরঞ্জন, যেগুলি বিচার-বিশ্লেষণের গালাইয়ের পরীক্ষায় একেবারেই গিল্টী প্রমাণিত হয়—তার মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণকেই আমি দেখাতে চেয়েছি। পর্যটকেরা যাঁরা পর্যটন বিবরণ রেখে যান—তাঁরা কিছুটা আত্মপ্রচার করবেনই। এখানে একটা সুবিধে থাকে, সেটা হল এই যে, তাঁর মাতৃভাষায় যে বিবরণ তিনি লেখেন—তার প্রচার তাঁর মাতৃভূমিতেই আবদ্ধ থাকে। তাঁর নিজের দেশের লোক পড়ে এবং জেনে বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, এই মহাত্মন এই মহাজ্ঞানী মহাজনকে তারা অবজ্ঞা করেছে এতকাল! এরপর কোন দিন যদি এ পর্যন্ত অজ্ঞাত কোন চীন পর্যটকের এমন কোন পর্যটন বিবরণ বের হয় যাতে আছে—

“তিনি ভারতবর্ষে···মহানগরীতে এসে তাঁর প্রতিভা দ্বারা রাজা মন্ত্রী গুণী পণ্ডিতদের অভিভূত করে দেওয়ার ফলে সসম্মানে গুরুসমাদরে গৃহীত হয়ে সেখানে কিছুকাল (প্রথমে চিরকাল পরে কিছুকাল) থাকতে অনুরুদ্ধ থাকলেন। তাঁকে থাকবার প্রসাদ দেওয়া হল —তাঁর পরিচর্যার জন্য পরিচারকের সঙ্গে একাধারে রূপসী ও বিদূষী কয়েকটি কন্যাকেও নিযুক্ত করা হল। হয়তো দেশের নিয়মানুসারে হল ঃ রূপ ও বিদ্যা নির্ণয়ের সময় পর্যটকের অহংবোধের রঙে তারা রঙীন হল। তাঁদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসও করলেন— তারাও করল ; কারণ এতে তারা অভ্যস্ত। এই জন্যই তারা চাকুরি পেয়েছে, কিন্তু তিনি ধরে নিলেন তারা তাঁর প্রতি অনুরক্ত। সেই অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য তিনি তাদের কাছে অনেক পাণ্ডিত্যের কথা বললেন। তারা সৌজন্যবশত হাসল। অথবা, পরিচারিকা বৃত্তি-ধারিণীর বিদ্যা আর কতটুকু—সে সত্যই কিছুটা বিস্মিত হল। এবং তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় একটু বিষণ্ণও হল। কিন্তু এই চীনা পর্যটনকারী সেক্ষেত্রে যদি লিখে থাকেন যে, এই পরিচারিকা ছুটি তাঁর আকণ্ঠ প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে মুষলধারে অশ্রু বিসর্জন করেছিল এবং বৌদ্ধ হিন্দুধর্মের চেয়েও তাঁর প্রচারিত লাওসে এবং কনফুসিয়াসের বাণীকেই মহত্তর মনে করেছিল। অথবা বুদ্ধের বাণীর এবং বৌদ্ধধর্মতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছিলেন তাতে তারা ভারতের গোপীদের কৃষ্ণানুরাগের মত তাঁকে ভগবানের অংশ এবং পরম প্রিয়তম পুরুষোত্তম বলে মনে করেছিল।” এমনতর একটি বিচিত্র বিবরণ আবিষ্কৃত হলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সে কালে আমরা তীর্থ পর্যটন করতাম, কিন্তু পর্যটন কাহিনী লিখতাম না, লিখতাম তীর্থ মাহাত্ম্য নিয়ে কাব্য-কাহিনী। ইতিহাস লিখতাম না, কাব্যের মাধ্যমে লিখতাম চরিত। মহারাজ হর্ষের সভাকবি বাণ হর্ষচরিত লিখেছেন— তা কাব্য। এ কালে—যে কালে আমরা পর্যটন করে পর্যটন কাহিনী লিখছি—তার মধ্যে চীনের ভ্রান্তির মত ভ্রান্তি কম নেই। এই

ধরনের উৎকট আত্মপ্রচার একদিকে—অন্যদিকে আমাদের শীলতা অনুযায়ী বা অন্য কোন কারণে সেই সব দেশ সম্পর্কে স্বর্গীয় প্রচারের আর শেষ নেই। আজ চীনের এই হিংস্র আত্মপ্রকাশের ফলে একদিনে একমুহূর্তেই বোধ করি সেগুলি এই কারণেই মিথ্যা হয়ে গেল। কিন্তু সে থাক। হিউয়েন সাঙের কথা বলি। হিউয়েন সাঙ ধর্মানুরাগী এবং জীবনে তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষু হবার বাসনা ছিল, তাই সম্ভবত এই ধরনের কিছু নেই। তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের গুরু-শিক্ষক হয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের সকল বৌদ্ধপণ্ডিতকে পরাজিত করেছিলেন, লিখেই তুষ্ট হয়েছিলেন। কোনকালে এ সত্য যাচাই হবে এ কল্পনা তিনি করেননি। তবে এর মধ্যে সম্রাটের গুরু-শিক্ষক এবং পূজনীয় হওয়ার কল্পনার মধ্যে চীনদেশের মানসপরিচয় আছে। যে ধাতুর কথা বলেছি—সব দেশেই মনের উপাদান এই ধাতু। ভারতবর্ষের ধাতু অনুযায়ী সম্রাট হর্ষের যে মন সেই মনের উপাদানের ধর্মানুযায়ী সহজে ছন্দে সহাস্যে নতজানু হয়েই চীন সম্রাটের লিপিকা গ্রহণ করেছিলেন। তৃণাদপি সুনীচেন এই বাক্যটি বৈষ্ণব যুগ থেকে প্রচলিত হলেও ভারতবর্ষের ভাবজগতে এই বিনয় ও শিষ্টাচারের স্থান সর্বাগ্রে। বৌদ্ধ আমলে এই ভাব বৌদ্ধসাধনার প্লাবনের পলিস্তরের উর্বরতায় সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল।

চীনের রাষ্ট্রদূত—ওয়াং হিউয়েন সি—, সম্রাট হর্ষবর্ধনের তিরোধানের পর এই শ্যাম-সমৃদ্ধিকে সহজলভ্য গোচারণ ভূমি ধরে নিয়ে তাঁর দেশ থেকে আনা একপাল অশ্ব-অশ্বতর এবং অশ্বতর পরিচারকের পায়ের ক্ষুর এবং পাচনির সাহায্যে বিপর্যস্ত এবং দখল করতে উদ্যত হলেন। চীনের জাতীয় চরিত্র (জাতীয় চরিত্র রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী যাঁরা তাঁদের মধ্যেই নগ্নভাবে প্রকাশ পায়) ঔদ্ধত্য এবং সমরপরায়ণতা হেতু তাঁরা নিজের দেশ থেকে কত দূরে এবং কতটুকু শক্তিই বা তাঁদের আছে বা থাকতে পারে সেটা ভুলেই গেলেন। ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন একেবারে বিশ্ব-শাসনকর্তার ভূমিকা

গ্রহণ করে। এখানে সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার কথাটা একটু বলা প্রয়োজন।

সম্রাট হর্ষবর্ধন মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশাল রাজ্য বা সাম্রাজ্যের শক্তিধর ন্যায্য উত্তরাধিকারীর অভাবে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ বাধল। হর্ষবর্ধন সম্ভবত অপুত্রক ছিলেন। অন্তত ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ নেই। এমন কি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্র নিয়ে যে বিবাদ তার মধ্যেও পাওয়া যায় না। এক কন্যার উল্লেখ রয়েছে। তাঁর বিবাহ হয়েছিল বলভীপতি ধ্রুবভট্টের সঙ্গে। তাঁদের পুত্র ধারা সেন (২য়) মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর চক্রবর্তী উপাধি নিয়ে তাঁর উত্তরাধিকার ঘোষণা করে সাম্রাজ্য অধিকারে উদ্যত হলেন। এবং অন্যান্য নানান দিক থেকে নানান শক্তিশালী রাজার অভ্যুত্থান হল। এরই মধ্যে গ্রহবর্মার ভাই এবং সম্রাট হর্ষবর্ধনের অন্যতম মন্ত্রী অরুণাশ্ব বা অর্জুন (তিনি তীরভুক্তির অধীশ্বরও ছিলেন) এই সংঘর্ষের মধ্যে অংশ নিয়ে সিংহাসন অধিকার করলেন। চীনের রাষ্ট্রদূত তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না। তিনি চীন থেকে ভারতে আসছিলেন—মধ্যপথে ছিলেন। ওয়াং হুয়েন সি রাজধানীতে উপস্থিত হলে অরুণাশ্ব বা অর্জুন তাঁকে পুরপ্রবেশ করতে দেননি। ওয়াং হুয়েন সি তিব্বত এবং নেপাল থেকে আট হাজার ছুশো সৈন্য সংগ্রহ করে অর্জুনকে পরাজিত এবং সপরিবারে বন্দী করেছিলেন ; সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁদের পদভরে কম্পিত হয়েছিল। তাঁদের নিজেদের বিবরণের মধ্যে লিখছেন—বারো হাজার নরনারী এবং তিরিশ হাজার পশু—গজ অশ্ব গবাদি নিয়ে এই মহারথী দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সগৌরবে। সম্ভবত হিমালয়ও বিকম্পিত হয়েছিল। আরও একটি কথা লক্ষ করবার বিষয় এই যে, চীনা রাজদূত ছাড়া উনিশ হাজার সৈন্যের কেউ চৈনিক ছিল না (বারশো তিব্বতী এবং সাত হাজার নেপালী)। এই আট হাজার ছুশো সৈন্য একজন চীনা রাজপুরুষের আদেশে বিয়াল্লিশ হাজার প্রাণীকে সম্ভবত মেষপালের

মত চীন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল বা নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদার যা বলছেন তুলে দিচ্ছি। গোড়াতেই তিনি সবিস্ময়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন—

"Accoustomed as we are (হুয়েন সাঙের কথা স্মরণ করে সম্ভবত) to the exaggeration and self-adulation of the Chinese writers, this account beats all records and reads more like a romance or a string of fables than sober history."

পরে হর্ষের তিরোধানের পর অর্জুনের সঙ্গে ওয়াং হুয়েন সি-র প্রথম সংঘর্ষে ওয়াং-এর পলায়নের কথা বর্ণনা (ওয়াংয়ের বিবরণ থেকেই) উদ্ধৃত করেছেন। এরপর ওয়াংয়ের বিবরণ ডঃ মজুমদারের ভাষায় এই—

"He (ওয়াং) fled under the cover of darkness at night and went to Tibet to ask for help. The Tibetan King....supplied 1200 picked troops and Amsuvarma King of Nepal gave him 7,000 horsemen as escort. With these recruits Wang Hiuen Tse determined to take revenge advandced as far as Cha-Pho-ho-lo the capital of mid India and captured for three days.

সে ভীষণ যুদ্ধ। মহামার ব্যাপার। ওয়াংয়ের মোট আট হাজার দুশো সৈন্য।

তারা সে যুদ্ধে কত শত্রু বধ করলে শুনুন।

Three thousand of the besieged were beheaded and ten thousand were drowned.

এখানেই শেষ নয়। অর্জুন পালিয়ে গিয়ে আবার সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। কিন্তু ঠিক হেরে গেল। এবং বন্দী হল। প্রথমেই মহাশক্তিধর ওয়াং কচাকচ এক হাজার সৈন্যকে

বলিদান দিলেন। ডঃ মজুমদারের কথাতেই বলি—কথাটা চীনা ওয়াং-এর, ডঃ মজুমদার ইংরেজী করে বলেছেন মাত্র—

"He (অর্জুন) was defeated and captured and one thousand of his troops were beheaded."

তারপর অর্জুনের পরিবারবর্গ এবং বারো হাজার ভারতীয়কে বন্দী করলেন ওয়াং, তিরিশ হাজার পশু (গরু-ঘোড়া-হাতী—?) জড়ো করলেন। তারপর—

Then whole of India trembled and 580 walled towns offered their submission. তখন Vaskaravarma the king of Eastern India sent the victor large quantities of provision and equipments.

এবং ওয়াং বিজয়ী মহাবীর (ভারতের) চীনে ফিরলেন।

ডঃ মজুমদার বলছেন—

"It was indeed a great marvel ! With only eight thousand soldiers borrowed from two neighbouring States Wang-Hiuen-Tse, far from his home, defied the great king who sat on Harsha's throne, fought a series of battle and won an easy and complete victory in each, killing 13,000 and imprisoning 12,000 over and above a large unspecified number. He captured enemy's capital city only after three days siege, and 580 walled towns submitted to him, evidently out of fear though his force consisted mainly of cavalry. And all these, including a return journey to China were accomplished in the course of a year or a little more."

বিবরণটি এবং ডঃ মজুমদারের বিশ্লেষণ পাশাপাশি রাখলেই

চীনদেশের জাতীয় চরিত্রটি রাত্রের জ্যোৎস্নায় বর্ণাঢ্য পুষ্পমাল্য বলে প্রতীয়মান বস্তুটি পূর্ণ দিবালোকে একটি অজগর হিসাবে প্রকটিত হয়ে উঠবে। হয়তো উপমাটা ঠিক হল না। বা একটু অস্পষ্ট হল। স্পষ্ট ভাষায় দাঁড়ায় এই। তা হলে চীনের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্য থেকে কোন্ স্বরূপে তাঁরা বেরিয়ে আসছেন। প্রথমতই নিজেদের সম্পর্কে দম্ভের অন্ত নেই, সেই দম্ভপ্রচারের সময়ে সত্যের কোন বালাই নেই, শুধু সত্যই বা কেন—সম্ভব বা অসম্ভব বলছেন—তারও কোন হিসাব নেই। দ্বিতীয়ত এরই অন্তরাল—এই মিথ্যা এবং অসম্ভব বিজয় গৌরব প্রচারের অন্তরালে একটি হিংস্র, সমরপিপাসু হত্যাকাণ্ড-লোলুপ এবং পররাজ্যে আধিপত্যকামী ভয়ঙ্কর চরিত্রের ছবি উঁকি মারছে। এবং আরও একটি সত্য প্রকাশ পাচ্ছে, তা এই যে, চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম গেছে—তারা নিজেরাই আগ্রহ সহকারে নিয়ে গেছে—খ্রীষ্টপূর্ব ত্রশো অব্দে এবং হর্ষবর্ধনের তিরোভাবের পর—এই ঘটনার কাল—৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হলে—আটশো বৎসরে জাতীয় চরিত্র থেকে অন্তত রাষ্ট্রীয় চরিত্রে প্রকৃতপক্ষে এতটুকু প্রভাব পড়েনি। পড়লে যে দেশ তাদের তীর্থস্থল, সেখানে তারা এই রক্তাক্ত উপদ্রব করতে সাহস করত না। সে দেশের তের হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস করে নিয়ে যেত না। রাষ্ট্রীয় জীবনে এরা লুণ্ঠক, সেই হান বংশের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। সে-চরিত্র বৌদ্ধধর্মও বদলাতে পারেনি এবং এই বিংশ শতাব্দীতে সাম্যবাদও পারেনি। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে এই দোষ সম্পূর্ণভাবে অর্শায় না বটে, তবে একটি সত্য এখানে না বলে উপায় নেই। যে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে গিয়েছিল—তার স্বরূপ আমরা তথাগতের বাণীর মধ্যে এবং জাতকের মধ্যে পেয়েছি; এই বৌদ্ধধর্ম চীনে গিয়ে এক বিচিত্ররূপ ধারণ করেছিল এবং তা আবার ভারতবর্ষেও ফিরে এসেছে; বহন করে এনেছিলেন ভারতবর্ষীয় তান্ত্রিকেরা। তার মধ্যে বশিষ্ঠ নামক একজন তান্ত্রিক বিখ্যাত। তিনি বামাচার ও বীরাচার মতে তন্ত্র-সাধনায় তারা উপাসক বলে

খ্যাত। বশিষ্ঠারাধিতা তারা এবং চীনাচার মতে দেবীর অর্চনা পঞ্চমকারযোগে তন্ত্র-সাধনার মধ্যে 'তারা' সাধনা বাংলাদেশে সুপ্রসিদ্ধ।

ডঃ মজুমদার চীন রাজদূত ওয়াং-এর এই সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ার কারণ ঠিক বুঝতে না পেরে বলছেন—এর কারণটা কি? ওয়াং নিজে বলেছেন—তিনি যখন রাজধানীতে প্রবেশ করতে এলেন—তখন হর্ষের সিংহাসন-আত্মসাৎকারী অরুণাশ্ব তাঁকে ঢুকতে দেননি। এবং ওয়াং-এর তিরিশজন সঙ্গীকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু কেন? কারণ অবশ্যই ছিল। পথে অর্থলোভে ডাকাতে লুটপাট করে, মাৎসন্যায়ের সময় উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত জনসাধারণও করে, এটা চিরকালই আছে। কিন্তু এক দেশের রাজদূত অন্য দেশে সমাগত হলে—তাকে এভাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না কেন এবং তাদের উপর আক্রমণই বা হবে কেন?

এর কারণ ডঃ মজুমদার যা লিখেছেন—তা উদ্ধৃত করবার আগে বর্তমান কালে চীন-ভারত সঙ্ঘর্ষের সময়ে—কলকাতা-বোম্বাই-এর চীনা কনস্যুলেটের কনসাল থেকে অন্য চীনা কর্মচারীরা যে উদ্ধত আচরণ করে গেছে তার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। এই বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীন ভারতবর্ষে বসে তাঁরা প্রাদেশিক সরকার এবং ভারত সরকারকে নানান তুচ্ছ অছিলায় তীব্র প্রতিবাদ নামক শব্দটির অন্তরালে যে রক্তচক্ষু এবং শাসানি দিয়ে গেছেন তা সর্বজনবিদিত। আমাদের দেশে চীনারা অনেকদিন থেকেই আছেন। কম্যুনিস্ট রাজত্ব চীনে প্রতিষ্ঠিত হবার পরও নানান ছুতোয় আরও অনেক চীনা এসেছেন। কলকাতার পথের মোড়ে মোড়ে ডাইংক্লিনিং খুলে বসলেন। এমনই ধরনের অন্য ব্যবসা (যার আয়ে কোন রকমে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনই চলে) করতে চীন থেকে ভারতবর্ষে আসবার কারণটা সরকার সেদিন ভেবে দেখতে চাননি। এখানকার বাসিন্দা চীনাদের কতজন কনস্যুলেটের মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্ট হল বা

সমর্থক হল—তা-ও পুলিস বিভাগ খোঁজ নিয়েছেন বা রেখেছেন কিনা সন্দেহ। যখন খোঁজে প্রবৃত্ত হল এ দেশের পুলিস তখন চীনা কনস্যুলেটের প্রতিনিধিদের কি ক্রোধ। এবং যাবার সময় পর্যন্ত তাঁরা হোটেলে বসে এমন কিছু করে গেছেন—যা বিধান সভার সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন, তা সঠিক কিনা জানি না (অবশ্য মেনে নিতেই হবে সঠিক বলে), কিন্তু অধিকাংশের কাছেই সন্তোষজনক মনে হয়নি—আমারও হয়নি। ভারতবর্ষের ভাগ্য ভাল যে, সরল বিশ্বাসে চীনকে বিশ্বাস করে, তাদের পায়রা ওড়ানোর খেল দেখে, তাদের শান্তিবাদী ভেবে, আমাদের অপ্রস্তুত থাকার সুযোগ চীন যে দ্রুতগতিতে নেফা অঞ্চলে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে (যদি সমগ্র পৃথিবীর ক্ষোভ ও ক্রোধ হেতু এবং ভারতের পাশে এসে দাঁড়াবার সঙ্কল্প ঘোষিত না হত এবং কিউবা সমস্যা নিয়ে চীনের পরমপ্রত্যাশিত রাশিয়া-আমেরিকার যুদ্ধটি হতে-হতে না থেমে যেত, তা হলে তারা অগ্রসর হতই।) চীনারা আসামে ঢুকলেই বঙ্গদেশের রাজধানীতে ওয়াং নামক চীনা রাজদূত সপ্তম শতাব্দীতে যা করেছিলেন—কলকাতার চীনা কনসালও তাই করতেন। এবং তখন প্রতি রাস্তার মোড়ে স্থাপিত এই ধোপাখানাগুলি এক-একটি মেশিনগানের ঘাঁটিতে পরিণত হত।

যাক—কোথা থেকে কোথায় এসেছি। তবে অবশ্য ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ওই ওয়াং-এর ঘটনা থেকে এই ১৯৬১ সালের চীনা কনসালের ভারত-ত্যাগ পর্যন্ত কালের দূরত্ব সুদীর্ঘ হলেও পথরেখাটি একেবারে সরল রেখা; একবার এদিক-ওদিক দুদিকে তাকালেই দেখা যাবে—সেই একই ধারা, একই পদ্ধতি—ওয়াং-এর পোশাক এবং ১৯৬২-র চীনা কনসালের পোশাকে তফাত থাকলেও মনে হবে, হয়তো দুজনেই, এক ব্যক্তি। এই সুদীর্ঘ তের শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে চীনের বহিরঙ্গে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বহুবার রাজবংশ বদলেছে, রাষ্ট্রতন্ত্রের কাঠামো বদলেছে, চীনের

রাষ্ট্রনায়কদের পরিচ্ছদও বদলেছে, কিন্তু অন্তর ও মানসদৃষ্টি এতটুকু বদলায়নি।

পুরনো কথায় ফেরা যাক। ডঃ মজুমদারও ওয়াং-এর বিষয়টি বিশ্লেষণ করে লিখছেন—সম্রাট হর্ষবর্ধনের তিরোভাবের পর তাঁর সিংহাসন এবং উত্তরাধিকার নিয়ে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠাকামী বিভিন্ন রাজন্যবর্গের যে অভ্যুত্থান এবং সঙ্ঘর্ষ ঘটেছিল, তারই মধ্যে কোন এক পক্ষের (যে পক্ষ অর্জুন বা অরুণাশ্বের বিরোধী) পক্ষাবলম্বন করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন বা সঙ্ঘর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

চীনের সেই বিচিত্র জীবনধাতুর খেলা। তারই প্রেরণায় তাদের মনের ধারণা, তারাই পৃথিবীর দণ্ডদাতা—দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা—বিশ্ব রাষ্ট্রবিধানের অধিনায়ক। ওয়াং কোন পক্ষের কাছে চীনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে—মাত্র তিরিশজন সঙ্গী নিয়েই এসে অরুণাশ্বের রাজধানীতে প্রবেশ করে বোধ হয় বলেছিলেন—"রে বিশ্বাসঘাতক, নাম্—নাম্ তুই সিংহাসন থেকে, নাম্। অন্যথায় চীন সম্রাটের নামে তোর শিরশ্ছেদ করব।"

ডঃ মজুমদার লিখেছেন—

"It is also quite likely that Harsha's death was followed by political disintegration and rise of ambitious chiefs who scrambled for the inheritance of the vast empire left without any strong and legitimate heir. Wang himself might have espoused the cause of one such rivals and thus created enemies for himself."

কথাটা might have বা সম্ভবত নয়। কথাটা নিশ্চিতরূপে। এবং এর অন্তরালে হিমালয়ের দক্ষিণে তাদের লুব্ধ দৃষ্টির পরিচয়ও আছে। কার্যত না পারলেও, বাস্তবে না হলেও তাদের মানস-কল্পনায় তাঁদের লেখার মধ্যে এ ইচ্ছাপূরণের পরিচয় রয়েছে। নেপাল

সম্পর্কেও এই সময়ে এই ওয়াং লিখে গেছেন যে, নেপাল রাজ্যে চীন সম্রাটের অধীনস্থ রাজা ছিলেন।

"The Chinese account represents Nepal, under him a peaceful, civilised and flourishing country." (Dr. Mazumdar)

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, নেপালের রাজারা এবং অধিবাসীরা হিন্দু ছিলেন। ভারতবর্ষীয় তো বটেই। অর্থাৎ চীন জাতির সঙ্গে কোন রক্তের সম্পর্ক বা সমাজ সম্পর্কেরও যোগাযোগ ছিল না। নেপাল রাজার ওয়াংকে সাত হাজার সৈন্য সাহায্যের যে কারণ তা অন্য।

হর্ষের রাজধানী কনৌজ এবং থানেশ্বর কোথায় এবং নেপাল কোথায়! দিগ্বিদিক-জ্ঞানহীন মিথ্যাবিলাসী ওয়াং লিখেছেন যে, যুদ্ধটা হয়েছিল নেপাল সীমান্তে। এবং এখানেই কল্পনাবিলাসের মধ্যে তাদের অভীপ্সা পূরণের মিথ্যাচার ধরা পড়ে গেছে।

"It is interesting to note that the scene of action is laid in Nepal border and not anywhere near Kanauj the capital of Harsha." (ডঃ মজুমদার)

নেপাল সীমান্তে এই সংঘর্ষে নেপালের রাজার লিপ্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তারই সঙ্গে যোগ দিয়ে ওয়াং এই গুরুতর গর্জন করে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর প্রাণ প্রকম্পিত করেছেন এবং চীনবাসীকে প্রবুদ্ধ করেছেন। এখানেই শেষ নয়, ওয়াং-এর পর তিব্বতের রাজাকে (যে রাজা তাকে ১২০০ সৈন্য সাহায্য করেছিল) প্ররোচিত করে কামরূপ বা আসাম আক্রমণ করেছিল বা করিয়েছিল।

"Whether the king of Kamrupa was connected with the strange political events that took place after the death of Harsha, cannot be determined. But the sequel was positively unfavourable to him and his

kingdom. The Tibetan king Sron-btsan-Sgam-Po, who was drawn into indian politics by the expedition of Wang-Hiuen-Tse, is said to have conquered Assm."

ডঃ মজুমদার বলেছেন—"There may be some truth in this."

আসাম জয় হয়তো সম্পূর্ণ সত্য না হতেও পারে ; হয়তো আট হাজার সৈন্য নিয়ে চৌদ্দ-পনের হাজার সৈন্যের শিরশ্ছেদ এবং তের হাজার সৈন্য ও নাগরিক বন্দী করার মত অলৌকিক কাহিনী হতে পারে। তবে এসে যে বর্বর আক্রমণ এবং যথেচ্ছ নরহত্যা ইত্যাদি করবার চেষ্টা একটা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। শিরশ্ছেদ কথাটা চীনারাই সত্য করে তুলতে পেরেছিল। তারা দণ্ড দিত—মানুষের মাথাটা একটা কাঠে রেখে ভারী দায়ের মত তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে কাটত।

বৌদ্ধ ধর্ম যে কি ধর্ম তার মর্মার্থ যে কি, তা কোন ভারতবাসীকে বলতে হবে না। আস্তিক্যবাদী ভারতবর্ষ অবতারবাদে বিশ্বাসী। তার বিশ্বাস, মানবাত্মা নিরন্তর যে বিবর্তনে জীবনতপস্যা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জৈবধর্মের স্বভাব—কাম ক্রোধ লোভ হিংসা মাৎসর্য প্রভৃতির অসৎপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে প্রেম, অক্রোধ, নির্লোভ বা ত্যাগ, অহিংসা ও বিনয়ের সৎপ্রকাশের দিকে চলেছে যার মধ্যে শান্তি, যার মধ্যে সুখ, যার মধ্যে অমৃতের স্বর্গ তার নিরন্তর যাত্রাপথের মধ্যে মধ্যে পরমাত্মার বাণী, এক বিরাট পুরুষের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ ও উচ্চারিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই এক অবতার। তিনি গীতা উচ্চারণ করে অর্জ্জুনকে অন্যায়কারী অত্যাচারীদের নিধনে প্রবুদ্ধ করলেন। এরপর আবার একটা দীর্ঘকাল পর এলেন বুদ্ধ। তিনি ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধতা করলেন এবং তার সঙ্গে বললেন—পাপীকে হত্যা করে পাপকে দূরীভূত করা যায় না। ওই

হত্যার মধ্যেই থাকে হিংসা, হিংসা পাপ, সে প্রতিশোধ কামনার রূপ নিয়ে শীতের বিবরের সাপের মত গ্রীষ্মের সুযোগের প্রতীক্ষা করে এবং যথাসময়ে নির্গত হয়ে আবার আনে রক্তারক্তি হানাহনি—হিংসা প্রতিশোধ, সংসারে শোক ক্রন্দন অসুখ অশান্তি। সুতরাং হিংসাকে পরিত্যাগ করে অহিংসাকে অবলম্বন কর; অবৈরিতার দ্বারা বৈরিতাকে জয় কর। প্রথম কালে ব্রাহ্মণসমাজ তাঁকে মানেনি, গ্রহণ করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে সমগ্র ভারত বুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী অবতার বলে মেনে নিয়েছিল। ভারতবর্ষে বা জগতেও যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধ নিবারণ চেষ্টা ত্যাগ করার বুদ্ধের বাণী পরমাত্মার বাণী। এই বাণী ও ধর্মের কল্যাণ ভারতের অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তাক্ত রণভূমিতে উপলব্ধি করে অবৈরিতার মন্ত্রে ও পুণ্যবলে বিশ্বে ভারত গৌরব বিস্তার করে ধর্ম বিজয় সমাপ্ত করেছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনও তাঁরই পরবর্তী যোগ্য পদাঙ্ক অনুসারী সম্রাট। এই ধর্ম চীনদেশে চীনারাই সাগ্রহে নিয়ে গিয়েছিল। মঠ তৈরী হয়েছিল—বহুজন বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েছিল। এদেশে দলে দলে এসেছিল তীর্থ দর্শনে। এদেশ থেকেও বহু মনীষী বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ফল কি হয়েছে?

একটা কথা বলি, মধ্যে মধ্যে এ দেশ থেকে বড় বড় ভিক্ষুকে নিয়ে যাবার জন্য এবং বৌদ্ধ মঠ লুঠ করে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র নিয়ে যাবার জন্য তারা তাদের ধাতুগত অভ্যাস অনুযায়ী সামরিক অভিযান চালাত। কথাটা বিচিত্র। অহিংস যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী বৌদ্ধধর্মের উপাদান—পুঁথির পাণ্ডিত্য এবং ব্যাখ্যার জন্য পণ্ডিত নিয়ে যাবার জন্য তারা যুদ্ধ করত, অভিযান চালাত। এর মধ্যে একটি আকূতিকে আমি স্বীকার করি। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি যে, এ আকূতি বাঘ বা ভালুকের নখ দিয়ে সমাদর করে ভালবাসার মতই ব্যর্থ।

কুমারজীবের কথার উল্লেখ করছি।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে সমগ্র

সেণ্ট্রাল এশিয়ার লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং চীনেও তার প্রবল প্রভাব তখন। চতুর্থ শতাব্দীতে সেণ্ট্রাল এশিয়ার 'কুচি' বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের এক তপস্যাধন্য গৌরবান্বিত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এবং দক্ষিণে ভারতের তুষার স্বর্গ কাশ্মীরের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিশ্ববিখ্যাত। এই ঐতিহাসিককালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কুশান নরপতিদের সদ্ধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর বৌদ্ধধর্ম চর্চায় শাস্ত্রানুশীলনে শুধু পাণ্ডিত্যেরই অধিকারী হয়নি—প্রজ্ঞার অধিকারীও হয়েছিল। সেণ্ট্রাল এশিয়া ও চীনের বৌদ্ধধর্ম চর্চার অব্যাহত স্রোতের উৎস ছিল কাশ্মীর। এ সময় কাশ্মীরের সঙ্গে মধ্য এশিয়ায় এই সূত্রে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল।

কাশ্মীর রাজ্যের সচিব পুত্র কুমারায়ণ। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হন এবং আত্মীয় একজনকে পৈতৃক সচিবপদ দিয়ে মধ্য এশিয়ার এই 'কুচী' রাজ্যের মঠে গমন করেন। এখানে অবস্থান কালে 'কুচী' রাজপরিবারে এক ভক্তিমতী কন্যা তাঁর নাম 'জীবা' তার গুণে রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই কুমারায়ণ ও জীবার পুত্র বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত ও ভিক্ষু—ভিক্ষু কুমারজীব। কুমারায়ণ হয়েছিলেন রাজগুরু। জীবা পুত্রের বয়স ন বৎসর হতেই তার মস্তক মুণ্ডিত করে ভিক্ষুত্বে দীক্ষিত করে নিজেও সঙ্ঘে চলে যান ভিক্ষুণী হয়ে। কুমারজীব কাশ্মীরে তাঁর অধ্যয়ন ও তপস্যা শেষ করে কুচীতে গিয়ে সেখানকার সঙ্ঘের প্রধান হন। তাঁর খ্যাতি কিছুদিনের মধ্যেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন চীনের সম্রাট তাঁকে আহ্বান করলেন—চীনে এস ভিক্ষুপ্রধান।

কুমারজীব যেতে চাইলেন না। কুচীও তাঁকে ছাড়তে চাইলেন না। এখানে বিবেচনার বিষয় এই যে, চীন চাচ্ছেন পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্য সেই ধর্মের উপাদান হিসাবে যার মূলমন্ত্র অহিংসা। কিন্তু চীন সম্রাট তাঁর ও তাঁদের জীবনের ধাতুগত দম্ভ এবং সমরপরায়ণতা

ছাড়তে পারলেন না। সৈন্য সেনাপতি অস্ত্র ঝনৎকারে ও দর্পিত পদভরে সব কম্পিত করে কুচী আক্রমণ করল। কুচী যুদ্ধ করেছিল অসীম বীরত্বের সঙ্গে। কিন্তু চীনের বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ক্ষুদ্র কুচীর জয়লাভ অসম্ভব। কুচী জয় করে বৌদ্ধশাস্ত্র ও অন্যান্য সম্পদ অশ্বতরের পিঠে চাপিয়ে কুমারজীবকে বন্দী করে নিয়ে গেল তারা।

সম্ভবত পরম বুদ্ধের আত্মা সেদিন শিউরে উঠেছিল।

একটি আগ্নেয়গিরি। তার গর্ভে যে ফুটন্ত ধাতু স্বভাব ও প্রকৃতিধর্মে অহরহ উর্ধ্বলোকে নিজেকে উৎক্ষিপ্ত করে তার নিজের উত্তাপ তার জীবনের মৃত্যুবিষ চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, তার মুখ যে কোন ধর্মের, সে বৌদ্ধ ধর্মের মন শান্তির ধর্মের অমৃত প্রলেপ দিয়ে একটি স্তর রচনা করলেই কি শান্ত হয়, না হতে পারে? হয়ত পারে না। তার প্রমাণ চীন তার ইতিহাসে বারবার দিয়েছে। বারবার। এবং যে ধর্ম অনুন্মত্ত, প্রশান্ত, সংযত, সকল শীলে সংহত সে ধর্মও এ দেশে স্বাভাবিক ভাবেই ওই বিকৃত বামাচারে পরিণত হয়। বর্তমান চীনে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-অনুপ্রাণিত চীনে বৌদ্ধ ধর্ম মুছেই গেছে প্রায়। যা আছে সে কেবল কম্যুনিজমের প্রচারে সাহায্যের জন্য আছে। কিন্তু তান্ত্রিকতার বীরাচার বর্জিত হয়নি। সমাদর পেয়েছে। এখানে চীনা কনস্যুলেটের উৎসবে নিমন্ত্রণে যাঁরা গেছেন তাঁরা এটা দেখেছেন। আমি নিজে কখনও যাইনি। শুনেছি। এটা এঁদের অস্ত্র। এবং তাঁদের ধাতুগত স্বভাবধর্ম এটি।

বৌদ্ধধর্মের মত একটি সদাচর ও শীলাশ্রিত ধর্ম চীনে কিভাবে তার জীবনধাতুর গুণদোষে (গুণ এখানে রাসায়নিক স্বভাবধর্ম) বিকৃত হয়ে বামাচারে পরিণত হয়েছিল তার বর্ণনা থাক, তবে হয়েছিল এটা সত্য। হবারই কথা। আধার এবং আধেয় সমধর্মী বা আধার গুণহীন না হলেই বিপরীত ক্রিয়ায় বিষ সৃষ্টি হয়। অমৃত বিষ হয়। আমাদের দেশে পূজার্চনার ক্ষেত্রে পিতলের পাত্রে নারকেলের জল

রাখলে শাস্ত্রানুসারে মদ হয়ে যায়। রসায়ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এর বহু প্রমাণ আছে। ঘি এবং তেলের ক্ষেত্রে পাত্রে কলঙ্ক ওঠা এবং বিষে পরিণত হওয়া ন লেই জানেন। চীনের জীবনধাতু অনুযায়ী তার জীবনপাত্রের স্পর্শে ঘৃতের মত পবিত্র বৌদ্ধধর্ম স্বাদে গুণে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। রঙ পর্যন্ত বদলে কেমন তুঁতের মত হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের দিক থেকেও সংঘাত এসে চীনের জীবন থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে ক্ষীণ এবং আরও বিকৃত করে দিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ) মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী সমরপিপাসু দুর্ধর্ষ কুবলাই খাঁ সমগ্র চীন অধিকার করলেন। কুবলাই খাঁ সম্পর্কে ইতিহাস লিখছে, "Kublai who was an able and energetic prince, adopted the Chinese mode of civilisation, greatly encouraged men of letters, made Buddhism the state religion, creating the office of Great Lama in Tibbet........But he was also an ambitious Sovereign and a prince who loved magnificence. He overthrew the Sung dynasty of southern China in 1276, and by 1280 the whole empire was under his uncontested rule. At different times he compelled Korea, Cochin-China, Burma, Java and some Malabar States in India to acknowledge his supremacy. An attempt was made to invade Japan in 1281 ended in disaster.

বিচিত্র আধার চীন এবং তার ইতিহাস ও সভ্যতার ধারা বিচিত্রতর হল ইতিহাসের ঘটনাচক্রে। কুবলাই খাঁয়ের মত রণপিপাসু সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট ডান হাতে ধরলেন তরবারি, বাঁ হাতে পোয়্যের মত অহিংসার অবতার পরম বুদ্ধের বাণীকে সমাদর করলেন। এইটির তাঁর অর্থাৎ চীনের যথার্থ স্বরূপ। এ তাঁর নিন্দার জন্যই বলছি না— এই পরস্পরবিরোধিতা বা চরিত্রগত ভারসাম্যহীনতা সব মানুষের সঙ্গে

সব জাতিরই আছে। ভারতবর্ষের চরিত্রেও এই ভারসাম্যহীনতা অবশ্যই আছে। তার বিশ্লেষণ পরে করব। চীনের এই ধাতুগত যুদ্ধপ্রিয়তা অন্য সকল জাতির উপর প্রভুত্বলিপ্সার প্রবল প্রবৃত্তির সঙ্গেই মানবচিত্তের অমৃততৃষ্ণাও নিশ্চয়ই আছে। সেই তৃষ্ণাতেই সে বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেছিল, এবং বাঁ হাতে ধরে রাখার মত ধরে রেখেছিল, কিন্তু তার প্রবল প্রবৃত্তি ও ধাতুগত প্রকৃতির কাছে সে নিষ্ফল হয়ে গেছে। কুবলাই খানের সময় হয়তো দিগ্বিজয়ের লুণ্ঠিত সামগ্রীর অনেক স্বর্ণ, অনেক রত্ন, অনেক ক্ষৌম বস্ত্র চীনের বৌদ্ধ বিহারগুলির মধ্যে স্থাপিত তথাগতের মূর্তির চরণে অর্পিতও হয়েছিল। হয়তো তথাগতের আত্মা বিষণ্ণ বেদনায় আশীর্বাদও করেছিলেন—তোমাদের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি মারের কবল থেকে মুক্ত হোক। কিন্তু ইতিহাস তা সফল হতে দেয়নি। বিশেষজ্ঞ যাঁরা চীন দেশে গিয়ে গবেষণা করে ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে চীনকে জেনে ও চিনে এসেছেন তাঁদের মতে ধর্ম বিষয়ে চীন কোন একটি দৃঢ় স্থিতিতে বা সুনির্দিষ্ট সাধনায় উপনীত হতে পারেনি। অবশ্য এই বিবরণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের। ইতিহাসের দিক থেকে যে ঘটনা সম্রাট কুবলাই খাঁ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ঘটে গেছে তা বাইরের ঘটনায় চীনের জীবনগতি ঊর্ধ্বমুখী নয়। অধোমুখী। কুবলাই খানের মোঙ্গল বংশের অধিকার ধ্বংস করে ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে মিং বংশের প্রতিষ্ঠা—মিংদের উচ্ছেদ করে মাঞ্চুতাতার বংশের প্রতিষ্ঠা হয় ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে। এই মাঞ্চু বংশই চীনে বেণীর সৃষ্টি করেছিল। এবং এদের আমলেই চীন প্রথম পশ্চিমী জাতির সংস্পর্শে এসেছিল। আফিঙে আসক্ত হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে সংঘর্ষ ঘটেছে বারবার। শাসন শৃঙ্খলা ভেঙে ভেঙে পড়েছে। শক্তির দিকে সংহতি হারিয়ে বিপুল জনশক্তি থাকতেও সারা পশ্চিমের লুণ্ঠনক্ষেত্র হয়ে পড়ার ইতিহাসই এই ইতিহাস। ধর্ম ও সমাজের

দিকেও ঠিক অনুরূপ অবস্থা। বিকৃতির দিক তো আছেই—এর উপর এল ইসলাম—তারপর কৃশ্চান ধর্ম।

এর মধ্যে চীনের মানুষের কাছে কোন ধর্মই প্রকৃতপক্ষে ছিল না। এ সম্পর্কে সে সময়ের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পর্যবেক্ষকেরা যা দেখেছেন তার বিবরণ এই—"As a matter of fact, Confutianism represents the intelligence and morality of China; Taoism (in its modern corrupt form) its superstitions; and Budhism its ritualism and idolatry, while yet it acknowledges no God; but at the same time all classes from the highest official personages downward! Coquet with both Budhism and Taoism to the extent of keeping up 'good form' in Solemn family matters."

অর্থাৎ বিকৃতির চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল সামাজিক জীবন। ঈশ্বর বা জগৎজীবন সম্পর্কে চিন্তা বা সমাজজীবনে সৎ শুদ্ধ আচার সবই বিকৃত হয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের জীবনেও বিকৃতি কম আসেনি—এসেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও এমন একটি তত্ত্ব বা সাধনা আমাদের জীবনে ছিল—আচারের আকারেই ছিল—যাতে অমূল্য প্রাণময় বীজ অক্ষয় হয়ে বেঁচে ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি—ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজনের আচারের কথা। সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মানুষদের মধ্যে যত সংখ্যক লোক নিরামিষভোজী, আহারের জন্য পশু-হত্যাবিমুখ, এত সংখ্যক নিরামিষভোজী পৃথিবীর কোন দেশেই নেই। বুদ্ধের উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব করুণার বীজ অক্ষয় হয়েই রয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে। এর কারণ ভারতের জীবনধাতুর পক্ষে অমৃতের ক্ষেত্র।

এখন ভারতবর্ষের কথা থাক।

চীনের অধঃপতনের মধ্যে তার সাম্রাজ্য গেল। কিন্তু চীন

কোন দিন তার চরম দুর্দিনেও এই সাম্রাজ্যের তৃষ্ণা এবং দাবি ভুলতে পারেনি। সমগ্র জাতিটি আফিঙে পঙ্গু হল। বলা বাহুল্য, মদ্যাসক্তি তার চিরদিনের (এখানে ভারতবর্ষের সম্পর্কে বলবার কথা এই যে, চরম বিকৃতির সময়েও ভারতবর্ষেই আচারের নামেই ধর্মানুশাসনকে মেনে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ মদ্য স্পর্শ করেনি)। শুধু তাই নয়, সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরে বন্দরে চীনারা আন্তর্জাতিক বে-আইনী কারবারের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করলে। তার অর্থাৎ চীনের সমাজ ও রাষ্ট্র বিকৃতি—জাতিগতভাবে তার উপর অহিফেনের প্রভাব, তার জীবনধাতুগত রক্তারক্তিপ্রিয়তাকে নিষ্ক্রিয় বা দমিত করতে পারেনি। ভারতবর্ষেও বিকৃতি অনেক ঘটেছে। হিন্দু বৌদ্ধ ভারতবর্ষে ইসলাম এসেছে। ইসলামের অধিকারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংঘর্ষ প্রচুর হয়েছে। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে ও সংঘর্ষে হয়েছে—বহিরাগত লুণ্ঠন ও অভিযানকারীদের আগমনে হয়েছে প্রচুর রক্তপাত। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত ভারতের মানুষেরা জীবনস্ফূর্তির অভাবে ম্রিয়মাণ হয়েছে—মূক হয়েছে—গাঁজা এবং আফিংও এদেশে চলেছে, কুসংস্কারাচ্ছন্নতার নিন্দা অর্জন করেছে, তার স্বভাবগত বিনয়ধর্ম বিকৃতির ফলে ভীরুতায় পরিণত হয়েছে, বিদেশীরা তাকে দাস বলে ঘৃণাও করেছে, কিন্তু রক্তপাতপ্রিয় বা লোলুপ চৌর্যপারঙ্গম মারাত্মক মানুষ বলে নিন্দিত হয়নি।

চীনের এবং ভারতের জীবনে কিছু আগে-পরে হলেও প্রায় কাছাকাছি কালেই পতনের পালা শেষ হয়ে অভ্যুদয়ের পালা শুরু হল। এর আগে পোর্টুগীজদের ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টনে পদার্পণ থেকে এবং তাদের পিছন পিছন পরসম্পদলোভী নানান ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের (যার মধ্যে ইংরেজ প্রধান) আগমন, আফিঙের ব্যবসা এবং সেই নিয়ে চীনের সম্রাট ও সরকারের সংঘর্ষ, যুদ্ধ—সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এর মধ্যে ১৮৯৪।৯৫ সালে জাপান চীনের হাত থেকে কোরিয়া কেড়ে নিয়েছে। ১৯০০ সালে বক্সার। বক্সারের

অপমানই বোধ করি চীনের জাতীয় জীবনের মার্যাদায় মর্মান্তিক আঘাত। সেই আঘাত থেকেই চীনের প্রাণের অভ্যুদয়-প্রচেষ্টা। আত্মা কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার এখানে করলাম না। আফিঙের জড়তা, কুসংস্কারের জড়তা, সকল ভয়ের জড়তার আবরণ, ইট-কাঠ-পাথরের কবর ঠেলে চীন আবার উঠতে চেষ্টা করলে। 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'য় অভ্যুদয় শুরু হল। নবজীবনের তৃষ্ণায় বিপ্লবপন্থী চীনা যুবকেরা তখন আমেরিকা-ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল নূতন শিক্ষার জন্য ও দীক্ষার জন্য। ১৯০৮ সালে সম্রাট কোয়াংসু গত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হল পরিবর্তন। ১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবর আরম্ভ হল হ্যাংকাও শহর থেকে। মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ হল। আমেরিকা থেকে এলেন মহান নেতা সানইয়াৎ সেন। ১৯১২ সালে নান্‌কিং শহরে ১লা জানুয়ারি সানইয়াৎ সেনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চীনের পত্তন হল। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পত্তনই হল, প্রতিষ্ঠা হল না। সারা চীন তখন তার স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন সমরনায়কদের অধীনে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হল। রক্তপাত-গৃহযুদ্ধে শান্তিশৃঙ্খলাহীন চীনের জীবন প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে গেল। প্রতি নায়কের চোখে লোভ-উদগ্র দৃষ্টি। উন্মাদের মত হানাহানি করে চলেছে—কে জিতবে? কে হবে চীনের অধিকারী?

চীনের পরম সৌভাগ্যবলে সে একজন নায়ককে পেয়েছিল—যিনি সত্যকারের সাধক। তাঁর জীবনতপস্যা শুধু চীনের নবজীবনের জন্যই ছিল না—তাঁর নিজের জীবনের জন্যও ছিল। যে নায়ক বা যে নেতা নিজেকে পরিশুদ্ধ বা নিজের জীবন ও চরিত্রের সংস্কার ও সংগঠন না করে দেশকে গঠন ও সমাজের সংস্কার করতে যান, তাঁর দ্বারা হয়তো বা নিজের স্বার্থসিদ্ধি হয়, দেশ অধিকারও করতে পারেন, কিন্তু দেশের কল্যাণ বা সংস্কার ও সংগঠন কখনও সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে মহান নায়ক নিজেকে সংগঠন করেন এবং দেশকেও সংগঠন করতে

চান, তাঁরই নেতৃত্বে মানুষ গড়ে দেশ, দেশ গড়ে মানুষ, কল্যাণ সেখানেই মূর্ত হয়ে ওঠে। এবং এই সংগঠন ও সংস্কারে শুধু শৃঙ্খলা, শক্তি সঞ্চয় ও বস্তুবিদ্যার শিক্ষাই সব নয়—প্রেম, প্রীতি, হৃদয়ের সততা ভিন্ন তা সম্পূর্ণ বা সার্থক হয় না।

মহাত্মা সানইয়াৎ সেন এমনই নেতা ছিলেন। তাঁরই শিষ্যরূপে, সহকারীরূপে চিয়াং কাইশেকের অভ্যুদয়। তাঁরই ছত্রছায়াতলে বর্তমান চীনের সকল নেতাই একদা আশ্রয় পেয়েছিলেন। এবং আজকের প্রতিষ্ঠার রথের পাথেয় সঞ্চয় করেছিলেন। এই মহান নেতার একটি কাজের এবং একটি উক্তির কথা উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে। ইতিহাসের কথাই তুলে দিচ্ছি। "A republic was proclaimed at Nanking on the Ist January 1912 with Sun Yat Sen as president. On the 11th February the empress-dowager and the emperor formally abdicated and on the 13th Yuan Shikai issued his first mandate as emergency president at Peking. The rival Nanking President Self-sacrificingly telegraphed his personal congratulation and considerately gave way as an official, arranging however, that Soldier's popular Hankow hero Li Yaan Hung his Vice President should also be the Vice President under Yuan Shi Kai."

এ ত্যাগের দৃষ্টান্ত বা ফল চীনের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র আদর্শের আবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি। যুদ্ধের উন্মাদনায় উন্মত্ত এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে লুব্ধ চীনা নায়কেরা নিরন্তর গৃহ-যুদ্ধে চীনের রাষ্ট্রীয় এবং জনজীবনকে ক্ষতবিক্ষত, নিঃস্ব, রিক্ত করে তুলেছিলেন। এরই মধ্যে এসেছিল প্রথম মহাযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ইংরেজের মিত্রশক্তিরূপে জাপান তার শক্তিকে দৃঢ়তর করে তুলে

চীনের এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে তার দরজায় এসে সদন্তে রক্তচক্ষুদৃষ্টি প্রসারিত করে তার কাছে ইতিহাস-কুখ্যাত একুশ দফা দাবি উপস্থিত করে দাঁড়াল। এর সংঘাতে চীনের নবসংগঠন আবার বিপর্যস্ত হয়ে গেল। পিকিং রাষ্ট্রশক্তি প্রকৃতপক্ষে হয়ে পড়ল পঙ্গু। তখন আবার সানইয়াৎ সেন ১৯১৮ সালে ক্যান্টনে এসে নতুন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে নূতন যাত্রা শুরু করলেন। নানান বিপর্যয়ে এই মহান বিপ্লবীকে এর পরও একবার আত্মগোপন করতে হয় এবং ১৯১১ সালে আবার তিনি আত্মপ্রকাশ করে জয়যাত্রা শুরু করেন। ১৯২৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুয়েমিণ্টাং সরকারের অধিনায়করূপে চিয়াং কাইশেক অধিষ্ঠিত হয়ে চীনকে একত্রিত করবার আয়োজনে সার্থক হতে থাকেন। এরই মধ্যে শুরু হল জাপানী যুদ্ধ। এবং এরই মধ্যে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা।

তার পূর্বে সানইয়াৎ সেনের একটি মহৎ উক্তির উল্লেখ করব। এই বিচক্ষণ সাধকশ্রেণীর মানুষটি চীনকে বুঝেছিলেন সেই সুমহৎ দৃষ্টিতে, যে দৃষ্টিতে মানুষ নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে আপনার দোষ কোথায় তাই দেখে সর্বাগ্রে। তিনি দেখেছিলেন এবং চীনের জীবনের ধাতুকে পরীক্ষা করে দেখে বলেছিলেন—চীনের সমগ্র ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় কলঙ্কিত। চীনের জাতীয় জীবনে এই লিপ্সা তার শক্তি ও চিত্তকে দুষ্ট করে রেখেছে। এই দোষকে স্খালন করতে হবে সর্বাগ্রে। এই অপরাধ থেকে চীনের ইতিহাসকে মুক্ত করতে হবে। পররাজ্যলোভ পরিত্যাগ করতে হবে চীনকে।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে এ সংশোধন, এ লোভ বর্জনের দীক্ষা বা তপস্যার সুযোগ আর হল না। চিয়াং কাইশেক জাতীয়তাবাদী এবং সানইয়াৎ সেনের অনুগামী নামে মাত্র। আসলে তিনি একনায়কত্বের সর্বাধিনায়কের মতই উগ্র দাম্ভিক কূটচরিত্র। চীনের ধাতুগত প্রবৃত্তিগুলি জাতীয়তাবাদের আবরণের মধ্যে পরিবর্তিত চেহারায় দেখা

দিল মাত্র। ইউরোপের পোশাক এল—ইউরোপের আগ্নেয়াস্ত্র এল—সমরকৌশল এল; এর বেশী কিছু না। সেই সমরনায়ক ·াধান্য, সেই সম্রাটের স্থলে চিয়াং কাইশেকের উগ্র দাম্ভিকতা, সেই সব। বরং ১৯১০।১১ সাল থেকে নিরন্তর যুদ্ধ করে যুদ্ধলিপ্সা তার বেড়ে গেল। ব্যাধির মতই তাকে আক্রমণ করলে। তাঁদের দেশের মধ্যে দলে দলে প্রতিপক্ষে প্রতিপক্ষের মধ্যে আচরণে যে ন্যায়হীন, নীতিহীন, ছলনাসর্বস্ব ব্যবহার করেছেন, তাই তাঁদের অভ্যাস হয়ে গেল। কনফুসিয়াস বুদ্ধ মানুষের মন থেকে নির্বাসিত হয়ে গলেন। এই মহাবিপর্যয়ের মধ্যে সমগ্র চীনে একটি বোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেটি ন্যায়-অন্যায়ের বোধ। উচ্চ স্তরে একেবারে নিশ্চিহ্ন, যা থাকল সে সাধারণ মানুষের মধ্যে, তাদের ঘর-সংসার-আপনজনকে কেন্দ্র করে। তার বেশী নয়। চিয়াং কাইশেক এবং মাও সে তুং, চৌ এন লাই এদের মধ্যে কতবার যে কত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং সে প্রতিশ্রুতির কত খেলাপ হয়েছে, তার এক দিকের কথা, চীনের কম্যুনিস্ট সরকার আজ ফলাও করে প্রচার করে থাকেন। অতিরঞ্জিত ইতিহাস, উপন্যাস, গল্প, নাটকও বহু রচিত হয়েছে তা নিয়ে। অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে তার মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু কম্যুনিস্টদের তরফ থেকে কতবার কত প্রতারণা হয়েছে তার কথা আজ না জানলেও চীনকে যারা চিনতে চেষ্টা করবেন তাঁরা চিনবেন।

১৯২১ সালের পর তখন মাঞ্চু সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছে। মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ১৯১১ সালের পর থেকেই স্বাধীন। সিংকিয়াং প্রদেশেও এই অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। এই সময় Yang ইয়াং নামে একজন চীনা সমরনায়ক সিংকিয়াং-এর শাসনকর্তা। স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল থেকে যখন প্রবলতর হল তখন Yang ঘোষণা করলেন—তিনি সিংকিয়াং-এর স্বাধীনতা ঘোষণা করে সেই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে দেবেন।

"Ultimately it was decided that the leaders of all

nationalities would meet at Yang's residence at Tihwa and put their seal on the 'Magna Carta' of Sinkiang freedom."

নেতারা বিশ্বাস করে সমবেত হলেন চীনা সমরনায়কের গৃহে। ভোজের আয়োজনে এমন একটু সমারোহ থাকারই কথা; ছিলও। তাঁরা খেতে বসেছেন—প্রথম পদ পরিবেশন করা হল। সঙ্গে সঙ্গে চীনা শাসনকর্তা উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—

"Pork? How is this that Pork being served to my Muslim guests?....He left the dining room. None of the guests suspected any foul trick being played on them. In a few minutes Yang appeared with one of his aids hanging a sword as a decoration to his striped trousers. The aid paused behind the Mongal leader and Yang pronounced his Judgement. This Mongal is a Buddhist. He eats flesh of any sort; it is he who has played a dirty trick on us. Behead him. The sword flashed....."

এইভাবেই সেদিন অপর সব নেতাদেরও হত্যা করা হয়েছিল এবং সিংকিয়াং-এর স্বাধীনতা আন্দোলনকে তখনকার মত দমন করেছিল এই চীনা সমরনায়ক। কিছু দিন পর ইয়াং নিজে নিহত হল। অবশ্য নিহত হল সে তার নিজের চীনা অনুচরদের হাতে। ১৯৩১ সালে সিংকিয়াং স্বাধীন হল। কিন্তু সিংকিয়াং-এর এই স্বাধীনতাও অন্য একজন চীনা সমরনায়ককে বিশ্বাস করে ধ্বংস হয়ে গেল। কিছু দিন পর মা চুঙ ইন Ma Chung Yin নামে একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী চীনা সমরনায়ক এল সিংকিয়াং-এ।

Very young at the age of sixteen he was appointed a colonel in the Chinese army.

ইনি চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদলের কর্নেল।

Being a Muslim he approached Singkiang people saying that he had mortal difference with the Government of China, because they suppressed Island. He came over to Singkiang to fight with the people against the Chinese rulers.

তারা বিশ্বাস করেছিল। কারণ সিংকিয়াং-এ মুসলমানই অধিকাংশ। স্বাধীন সিংকিয়াং-এর যে পতাকা তারা তখন উড্ডীন করেছিল তাতে ইসলামের চন্দ্রকলা ও তারকাই ছিল প্রতীক। এবং কিছুকাল পর নির্বিচারে সিংকিয়াং-এর অধিবাসীদের ও নেতাদের হত্যা করে তাদের স্বাধীনতা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

এই ধরনের প্রতারণা, ছলনা চীনের জীবনে অবনতি ও বিপর্যয়ের মধ্যে একটা অতি সাধারণ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ যদি চিয়াং কাইশেক চীনের মধ্যে সর্বাধিনায়কের শক্তিতে ও গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকতেন তাহলে ভারতবর্ষ ও চীন সীমান্ত নিয়ে বিরোধ আরও আগেই বাধত এবং সম্ভবত যুদ্ধের মধ্য দিয়েই এর মীমাংসা-পর্ব এতদিন শেষ হয়েই যেত।

আজ এই কোলাহল এবং ফরমোজার চিয়াং কাইশেকের আত্ম-নির্বাসনের সকরুণ অবস্থার জন্য ১৯৪৬।৪৭ সালের কথা অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু হয়তো স্মরণ করবার চেষ্টা করলেই মনে পড়বে যে, "In 1946-47 Kuomintang Government despatched as 'many' as four protests to the Government of India in connection with a small territory of NEFA, with a fifth one handed over in November 1949 which mererly stated that China had not signed the Simla convention." (White paper III)

এখানে আর একটি তথ্য জানিয়ে বা মনে করিয়ে দিচ্ছি। সেটা

হল তিব্বতের কথা। কুয়োমিণ্টাং-এর এই প্রতিবাদের পিছনে পিছনে তিব্বতও তার দৃষ্টান্তে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল।

The Indian mission in Lasha forwarded to the Government of India a telegram dated the 16th October 1947 from Tibetan Bureau. The telegram asked for the return of the alleged Tibetan territories on boundaries of India and Tibet such as Sayul and Walong and in the region of Pemako Lonag Lopa Mon Bhutan Sikkim. Darjeeling and other on this side of river Ganjes and Lowo, Ladhakhete upto the boundary of Yarkhim. (White paper II).

১৯৪৭ সাল বিগত হয়েছে আজ পনের বৎসর। এর মধ্যে তিব্বত চীনের কবলগত হয়েছে। সুতরাং তিব্বতের সেই দাবি চীনের দাবি বলে নূতন করে উপস্থাপিত হলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। চীনের ধাতুপ্রকৃতিতে সমরপ্রবৃত্তির উপাদান রয়েছে। সে উপাদান এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবৃত্তিও আজ মার্জনায়, চর্চায়, নূতন সংগঠনে অধিকতর কাঠিন্য অর্জন করেছে। তার উপর কম্যুনিজমের আশ্রয়ে সে ধাতু এবং প্রবৃত্তি একটি আদর্শগত সমর্থনের আশ্রয়দণ্ড ধরে সর্ব সঙ্কোচের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। সুতরাং—। তার আগে চীনের কম্যুনিজমের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

চার

এর পর কম্যুনিস্ট পার্টি মার্শাল চিয়াংকাইশেককে বিতাড়িত করে সমগ্র চীনে কম্যুনিজমকে জীবন-ধর্ম করে তুললে। চীনের জীবন-ধাতু এই কম্যুনিজমের মধ্যে খুঁজে পেলে সার্থক হবার শক্তি—আগুন যেমন শুকনো কাঠ-খড়ের মধ্যে পায় লেলিহান শিখায় জ্বলে ওঠার মত শক্তি,

বন্যা যেমন পায় নিচু জমি খাল-বিলে উত্তাল হয়ে ওঠার ক্ষেত্র—ঠিক তেমনিভাবে কম্যুনিজম চীনের জীবন-ধাতুতে এবং চীনের জীবন-ধাতু কম্যুনিজমের মধ্যে পেলে সফল এবং সার্থক হবার সুযোগ, ক্ষেত্র, উপাদান, শক্তি—সব কিছু। তাদের প্রাচীনকালের দেশ-দেশান্তর অভিযানের ইতিহাস ছিল তাদের সুখ-স্বপ্নের মত। হওয়াই স্বাভাবিক। এর একটা দৃষ্টান্ত আছে, চীনের হান সম্রাটদের অধিনায়কত্বে প্রথম দেশ-বিজয় করে এক সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর কত বংশ চীনে রাজত্ব করেছে। কিন্তু চীন বরাবর নিজেদের হান বংশের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করেছে। চীন জাতিকেই হান সন্তান বলেছে অনেকে।

কম্যুনিজমের আলোচনা এখানে অবান্তর। তবুও কম্যুনিজমের মধ্যে সমরতন্ত্রপরতা আছে—রক্তপাতের মধ্যে আনন্দ আছে। হিংসাত্মক যুদ্ধের মধ্য দিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠার পন্থার নির্দেশ আছে—তাই তার জীবন-ধাতুর পক্ষে হয়েছিল আশ্চর্যরূপে উপযোগী। এবং চীনে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে খড়্গাঘাতে বলি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। কম্যুনিজমের এই ভয়ঙ্কর নৃশংস রূপটি—সাধারণতঃ ঢাকা দেওয়া থাকে—সকল মানুষের সমান অধিকার বা সাম্যবাদের মনোহর কল্পনার সযত্ন আবরণে। এবং মানুষের মনের অবদমিত হিংসা ও অপরজন-অসহিষ্ণুতা (পরশ্রীকাতরতা তার পরের পর্যায়) এই অঙ্কের আসল রূপকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে না দিয়েই প্রলুব্ধ করে।

মানুষের সাংসারে সৃষ্টির বা স্রষ্টার দান করুণা ও প্রেম। সেখানে পশু-প্রবৃত্তিগত হিংসাও আছে। কিন্তু বহু বিবর্তনই বলুন বা বহু তপস্যাই বলুন, তার দ্বারা প্রেম, করুণা, বিচারবুদ্ধি, পশুপ্রবৃত্তি, হিংসা, লোভ-ক্রোধকে দমিত করবার মত পুষ্টিলাভ করে শক্তি অর্জন করেছে। অপরের বিচার—অপরের বাধার চেয়েও বোধ করি নিজের মনের বিচার করুণা-প্রেম, হিংসা-ক্রোধ লোভের পথে বড় বাধা হয়ে

দাঁড়ায়। নিজের কাছেই সর্বাগ্রে এর জন্য কৈফিয়ত দিতে হয় মানুষকে। একদা পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ যখন সামরিক শক্তিতে প্রবল হয়ে উঠেছেন এবং নিরীহ বাণিজ্যব্যপদেশে এসে যখন তারা ছলে-বলে-কৌশলে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, তখন তারা অনুরূপ বাধার—যে-বাধা তাদের অন্তর এবং বাহিরের জগতের কাছ থেকে এসেছে—সম্মুখীন হয়েছে। তারা একটি কৈফিয়তও আবিষ্কার করেছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন এই দেশে তারা আলো জ্বালতে এসেছে। অসভ্য মানুষকে সভ্য করতে এসেছে। চীন দেশে বিপ্লবের পর যে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা হয়েছে তেমনভাবে নরহত্যা তারা করেনি। বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে চীনের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চীনের ধাতুগত সমরতন্ত্রপরতা যুদ্ধোন্মাদনার মধ্যে যে রক্তপাতের নেশা জেগেছিল, বিপ্লবের পর চিয়াংকাইশেককে বিতাড়িত করে প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং বুর্জোয়াত্বের অপরাধে তারা এই অবাধ নরহত্যা চালিয়েছে বিচারের নামে। কম্যুনিজমের মধ্য থেকেই তারা এই বিচারের অধিকার পেয়েছিল। কম্যুনিজমই তাদের এই ন্যায় ও নির্দেশ সরবরাহ করেছিল। রুশ দেশেও বিপ্লবের পর এমনই হত্যাকাণ্ড চলেছিল। কম্যুনিজমের মধ্যে সত্যকারের অনেক নীতি আছে—অনেক নির্দেশ আছে—যা থেকে পৃথিবীর মানবসমাজের কল্যাণকর রূপান্তর হতে পারে। কিন্তু এই হিংসার নীতি, এই বিরোধী সকল শক্তিকে—রক্তস্রোতে নিশ্চিহ্ন করবার নির্দেশ এবং বিপ্লবের পর নিছক সামরিক শক্তিতে সমাজ ও ব্যক্তির সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করার নীতির মত অশুভ এবং অমঙ্গলজনক আর কিছু হতে পারে না। এই ধরনের ন্যায়, নীতি ও নির্দেশ প্রকৃতির রাজ্যে পরীক্ষিত হয়নি তা নয়, প্রাণ-প্রকৃতি এ পরীক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে, অমঙ্গল ও অশুভের পরিণাম দেখে সে ন্যায়, সে নীতি সে নির্দেশ উইপোকা, বন্য পিঁপড়ে প্রভৃতি স্তরে পরীক্ষার পরই সংবরণ করেছেন নিজে থেকে। মানুষের সমাজে, রাজ্যে এই শক্তির যথেচ্ছাচার বেশী

কাল চলে না, চলতে পারে না। রুশদেশে প্রথম কম্যুনিস্ট বিপ্লব হয়েছিল। মহামানবের তুল্য প্রজ্ঞার অধিকারী লেনিন ছিলেন অধিনায়ক। তাঁর কালে এই বিপ্লবকে ব্যর্থ করবার জন্য সমগ্র ইওরোপী শক্তিবর্গ রাশিয়াকে বেষ্টন করে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করেছে। স্থান-কাল-পাত্র এই তিনের সমন্বয়ে জগৎ এবং জীবনের যে স্থিতি— যাকে না মেনে উপায় নেই, সেই স্থিতির জন্যেই বাহিরের এবং ভিতরের সকল জটিলতাকে ব্যর্থ করতেই এই প্রজ্ঞার অধিকারী লেনিনকেও আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল দেশের অভ্যন্তরে, মানুষের অভ্যন্তরে, ছাড়া-পাওয়া হিংসা-লোভ-কামার্ততার বর্বর শক্তির কাছে। স্ট্যালিন লেনিনের ডান হাত, তিনি এই শক্তিতেই বিশ্বাসী; লেলিনের মৃত্যুর পর তিনি মহাভ্রান্তিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন নিজের অধিকারে। কুটিলা তামসী-রূপা মহাপ্রকৃতি নিজের সুযোগ ছাড়েননি। তিনি আশ্রয় করেছিলেন কম্যুনিজমের এই নিষ্ঠুর অমানুষিকতাকে। আলোকের, মঙ্গলের সকল তপস্যাকে ব্যর্থ করেই তামসী সার্থক। আমার বিশ্বাস, লেনিন আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে হয়তো কম্যুনিজমের এই মহা অন্যায় থেকে মহাজাতিকে সংশোধন করতেন। কিন্তু তা হয়নি। অথবা তা হয় না। কোন মহামানবই এমন কোন নীতি ও ন্যায়সঙ্গত,ধর্ম বা বাদ প্রবর্তন করে যেতে পারেন না যা অভ্রান্ত অপরিবর্তনীয় এবং মহাকালের পদক্ষেপ সহ্য করেও অক্ষয় এবং অজীর্ণ থাকে বা থাকতে পারে। থাকে না। তা থাকলে বুদ্ধের ধর্মের পরিণতি মানুষকে প্রেমার্দ্রচিত্ত, করুণাঘন করেই সার্থক করত, পরিণতিতে কোমল থেকে কোমলতর করে সকল প্রকার সঙ্ঘর্ষবিমুখ, নিরীহতার আতিশয্যে ভীরু, এমন কি নিষ্ক্রিয় শক্তি করে তুলত না। পরম বুদ্ধের করুণা, অহিংসা, বীর্যবিমুখ বা বা বীর্যহীন নয়—অমিতবীর্যের আধার। সে করুণা, সে অহিংসা, চণ্ডাশোককে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত করে। কিন্তু সকল মানুষই তো অশোকের মত আধার নয়। এবং সব মানুষের জীবনে সে তপস্যাই

বা কোথায়? লেনিনের ধাতু লেনিনের তপস্যা—তাঁর প্রজ্ঞা স্ট্যালিনের ছিল না। ধাতুভেদে বিদ্যুৎশক্তি ধারণ-ক্ষমতা ও তার ক্রিয়ার তারতম্যের মতই সকল ধর্ম, সকল বাদ স্বতন্ত্র গুণে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমার বিশ্বাস, লেনিন আরও দীর্ঘদিন জীবিত থাকলে কম্যুনিজমের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মূল তত্ত্বের ত্রুটিকে সংশোধন করতেন। হয়তো করতেনও না। মহামানবও মানব। মানবিক ত্রুটির ছিদ্র সে রেখে যেতে বাধ্য। তার মধ্য দিয়েই কালের কালনাগিনী প্রবেশ করে জীবন-লীলার বিধানে।

থাক, কম্যুনিজমের তত্ত্ববিচার বড় দুরূহ কথা। আমি সে ক্ষেত্রে অন্তত পণ্ডিতী মতে অধিকারীই নই। আমি শুধু আমার বিশ্বাসের কথা লিখলাম। ভারতবর্ষের ধর্মে, সাধনায়, গতিতে, বিশ্লেষণ করলে অনুরূপ পতন, অভ্যুদয়, বন্ধুরতার বিচিত্র দৃষ্টান্ত মিলবে। সে-তত্ত্ব ও তথ্য ভারতবর্ষের মানুষের জানা। শুধু উল্লেখ করলেই সচেতন হবে মন। অহিংসা এবং মানুষের উপর বিশ্বাসের মাত্রাধিক্য হেতু বর্তমান বিপর্যয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থার কথাই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

চীনের কথা বলি।

চীনের জীবন-ধাতু নানান কারণে, হয়তো কিছুটা ভৌগোলিক কারণে, কিছুটা মঙ্গোলীয় মানব-জাতির জীবন-ধাতুর বৈশিষ্ট্যে, কিছুটা তার সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্ঘর্ষ-সর্বস্বতায়, কিছুটা প্রাথমিক উপলব্ধিগত সভ্যতার নীতি অনুযায়ী সমরতন্ত্রপর। সমরতন্ত্রে তার স্বাভাবিক জীবনোল্লাস। খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ কাল থেকে একাল পর্যন্ত—হান বংশ থেকে চিয়াং-কাইশেক—মাও সে-তুং পর্যন্ত কনফুসিয়াস, তথাগত বুদ্ধ এবং বিংশ শতাব্দীতে বর্তমান চীনের সঞ্জীবনী মন্ত্রের মন্ত্রদাতা সান-ইয়াৎ সেনের সকল বাণী, সকল ধর্ম, সকল নির্দেশকে ব্যর্থ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যখন সে কম্যুনিজমে এসে পৌঁছল তখন সে হত্যায়, রক্তপাতে, যুদ্ধে একটা ন্যায়ের ও নীতির খুঁটিকে আঁকড়ে ধরতে পেরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। বিচারের নামে নির্বিচারে

অবাধ হত্যাকাণ্ড চলল। চীনের মাটি রক্তাক্ত হল। কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসরের মধ্যেই চীনের সর্বাধিনায়কের একটি বক্তৃতার অনুবাদ আমি পড়েছিলাম। তাতে তিনি বহু মানুষকে হত্যা করার পশ্চিমী অভিযোগের উত্তরে সদম্ভে সগর্বে বলেছিলেন—"হ্যাঁ মহাশয়, আমরা এত লক্ষ (কত তা ঠিক মনে নেই) প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব বিরোধীকে হত্যা করিয়াছি। যতক্ষণ না চীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত হইতে বিমুক্ত না হয়, ততক্ষণ প্রয়োজনে আরও হত্যা আমরা করিব।" এই বক্তৃতার অনুবাদ অগ্রণী মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিহাসের বিচারেও এই হত্যাই ছিল স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। সমরোল্লাসপরায়ণ সাম্রাজ্যবাদী একটি জাতি ক্রমান্বয়ে চল্লিশ বৎসর গৃহযুদ্ধ, তার মধ্যে জাপান আক্রমণে যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে কম্যুনিজমের—প্রতিক্রিয়াশীল হত্যা একটি মহান নীতি এই নির্দেশের আশ্রয় পেয়ে এমন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হবে—তাতে অস্বাভাবিকতা কোথায়। আমাদের ভারতবর্ষ যে ভারতবর্ষ—যেখানে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ তিরিশ বৎসর জীবনাবেগের বৃহৎ ধারাটি মহাত্মাজীর অহিংসার দ্বারা পরিচালিত, একটি অংশ নেতাজীর শক্তি-প্রয়োগে এবং বিশ্বপরিস্থিতির বিচিত্র সংস্থানে ক্ষমতা হস্তান্তরিত-করণের ফলে আমরা যা পেলাম সেখানেও আমাদের হিংসা বা মুসলমান সঙ্ঘর্ষে ইতিহাসের ঋণশোধের জন্য রক্তপাত কিছুটা হয়েছে। আমরা তার জন্য আমাদের জীবন-ধাতু অনুযায়ী আন্তরিক বেদনায় অশ্রুপাত করেছি। অনুতাপ প্রকাশ করেছি। চীন উল্লাস প্রকাশ করেছে। সেটার প্রথম কারণ তার জীবন-ধাতু, দ্বিতীয় কারণ তার জীবনে কম্যুনিজমের নির্দেশ নূতন ন্যায়। যা তার কাছে কনফুসিয়াস,—বুদ্ধের বাণী থেকে মহত্তর এবং অভ্রান্ত।

* * *

চীনে কম্যুনিজম এসেছে প্রায় তার নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে। কম্যুনিজমের একটি নির্দেশ, যেমন—দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধর্ম,

সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে নিশ্চিহ্ন করলে সম্পূর্ণ হয় না বা হতে পারে না, তেমনি অপর একটি নির্দেশ—একক স্বদেশের ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হল না। সমগ্র বিশ্বে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে তবে তা সম্পূর্ণ হবে। দুনিয়ার কিষাণ মজদুর এক হও—এই ধ্বনি গভীর ব্যঞ্জনাত্মক।

রাশিয়ার প্রতিবেশী চীন। রাশিয়ার বিপ্লবের পর চীনের তরুণ এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন কতিপয় ব্যক্তির দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৮ সালে রাশিয়ার দিকে এবং মার্ক্সবাদের দিকে আবদ্ধ হল। এর মূল কারণকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। এক আপাত বা প্রথম দৃষ্টিতে সাম্যবাদের মেকআপে প্রসাধিত মার্ক্সবাদের মনোহারী রূপের আকর্ষণ, অপরটি গণ-বিপ্লব। সব মানুষের হিংসাকে একত্রিত করে যে মরণোন্মাদ প্রবল হিংসার ভয়ঙ্কর শক্তি সৃষ্টি করা যায়, তার প্রমত্ত আকর্ষণ ও মোহ।

১৯১৮ সাল। তখন মহান সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনে এক সুস্থ যুবশক্তির জাগরণ ঘটেছে, সেই সময় পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্সবাদ আলোচনার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। দুজন অধ্যাপক ছিলেন এর মূলাধার বা উদ্যোক্তা। Li Ta-Chao এবং Ch'en Tu-hosue। মাও সে-তুং তখন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক বা একজন কর্মী। তিনিও সভ্য হিসাবে এই সমিতিতে যোগদান করেন। পূর্বেই বলেছি, মার্ক্সবাদের বিধানে একটি দেশে মার্ক্সবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই মার্ক্সবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না, মার্ক্সবাদীর বক্তব্যও শেষ হয় না, বাস্তবতার দিক থেকে ধনবাদী দেশ থাকতে মার্ক্সবাদী ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে মার্ক্সবাদীদলের সুখের ও সাধের দণ্ডমুণ্ডের অধিকার ও আসন নিরাপদ হয় না। এই সূত্র বা নির্দেশও কূটনৈতিক প্রয়োজনে রাশিয়া গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নবজাগরণ-প্রয়াসী প্রতিবেশী চীন রাজ্যে তার ধর্মপ্রচারের প্রচারক পাঠালে।

১৯২০ সালের বসন্তকালে, বসন্তদূতের মত এলেন রুশ প্রচারক —গ্রেগরী ভিতোনিস্কি। রুশ সরকার নয়, কমিণ্টার্ন পাঠালে তাকে। কমিণ্টার্ন হল কম্যুনিজমের উৎস কেন্দ্র—আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে যত কম্যুনিস্ট দল আছে সবারই টারবাইন ঘোরানোর জলাধার। ওই জলাধারের জলেই কম্যুনিজম বিদ্যুৎশক্তি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে। এই কমিণ্টার্ন যে-দেশের কব্জায় থাকে, তারই কব্জির জোরেই চলে দুনিয়ার কম্যুনিস্ট দলগুলি।

কমিণ্টার্ন প্রেরিত 'ভিতোনিস্কি' চীনে এসে প্রথম সাংহাইয়ে কিছু বামপন্থীদের নিয়ে প্রথম একটি কম্যুনিস্ট দলের পত্তন করেন। এক বৎসরের মধ্যেই পিকিং, হুনান, হুপেই এবং আরও কয়েকটি প্রদেশে এমনই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান—চীনের রাষ্ট্র ও সমাজের অরাজকতার বন্যাপ্লাবনের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মত গড়ে ওঠে। এখানে, অর্থাৎ চীনের ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যেই এর শেষ নয়, জাপান এবং প্যারিসেও চীনা নব্যতন্ত্রবাদীদের নিয়ে সমিতি গঠিত হয়। মাও সে-তুং হুনান দলের কর্তৃত্ব দখল করেন। চৌ এন-লাই তখন প্যারিসে। প্যারিসে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টিতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন ছোট ছোট এই দলগুলিকে একত্রিত করে একটি দল—চীন কম্যুনিস্ট পার্টি C P C গঠিত হয় ১৯২১ সালের ১লা জুলাই; স্থান সাংহাই বালিকা বিদ্যালয়। সাংহাই তখন আন্তর্জাতিক নগরী। কিন্তু এখানেও নিরাপত্তার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগঠন শেষ হয় না; স্থগিত রাখা হয় এবং চেকিয়াং (Chekiang) প্রদেশে Neihpu হ্রদের উপর নৌকাবক্ষে C P C গঠিত হয়।

কুয়োমিণ্টাং জাতীয়তাবাদী দলের নেতা তখন সমগ্র চীনে এবং পৃথিবীতেও সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা ও মনীষী সান-ইয়াৎ সেন। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্তত তাঁর এবং তাঁর দলের সঙ্গে একটা আপস না করে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে গড়ে তোলা সুকঠিন ছিল। আমাদের

দেশেও তাই হয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষপুটেই কম্যুনিস্ট পার্টির গড়ে ওঠা এবং বেড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছিল। জাতীয় জীবনে সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাহীন একদল অত্যুৎসাহী সব দেশেই সবকালে থাকে; তারা প্রগতির দোহাই দিয়ে দেশের ও বর্তমানের ভালো-মন্দ সব কিছুকে নির্বিচারে বিসর্জন দিয়ে নতুন একটা ঝকমকে কিছুকে আশ্রয় করে বসে। ইসলাম যখন এসেছে, তখনও তাই হয়েছে, কৃশ্চানিটি যখন এসেছে, তখনও তাই হয়েছে। কম্যুনিজমের বেলাতেও তাই। এক্ষেত্রে একটু বেশী সুবিধা থাকে বা ছিল। কারণ ধর্ম এবং সমাজের বন্ধন প্রকাশ্যে ছিন্ন করতে হয় না; নিছক রাজনৈতিক মতবাদ বলে চলে যায় বা গেছে। এবং কম্যুনিজমের যে সাম্যবাদী মেক-আপের কথা বলেছি, সে মেক-আপ যতক্ষণ কম্যুনিস্ট পার্টি শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিষ্ঠুর শক্তিবাদ ও একনায়কত্বের তেল-সাবান দিয়ে তুলে না ফেলে, ততক্ষণ তার নিষ্ঠুরতম অমানুষিক রূপটি বোঝা যায় না। যাঁরা কম্যুনিস্ট হন তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারেন না। ধর্মাচরণের নিষ্ঠা ভারসাম্য হারিয়ে মানুষকে যেমন অমানুষিক শুচিবাইগ্রস্ত এবং হৃদয়হীন ধার্মিকে পরিণত করে—এও ঠিক তেমনি। কিন্তু প্রথম প্রতিষ্ঠার কালে তা নয়, তখন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, আশ্বাসদাতার প্রয়োজন হয়, উপদেশদাতার প্রয়োজন হয়। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টিরও সান-ইয়াৎ সেনের ও জাতীয়তাবাদী দলের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থনের প্রয়োজন হয়েছিল। এবং চীনের জীবনান্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টি সান-ইয়াৎ সেনের অনুগামীই ছিল—জ্যেষ্ঠের পশ্চাতে কনিষ্ঠের মত, অথবা বৃহতের পশ্চাতে ক্ষুদ্রের মত। এই নিয়মেই চীনা কম্যুনিস্ট দল এবং তাদের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন একসঙ্গে ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের সমীপস্থ হন। ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট প্রতিনিধি Adlof Toffe এবং ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন এক যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ করেন—তাতে এই কথা ছিল:

"Communist order or even the Soviet system can

not actually be introduced into China because there do not exist here the conditions for the successful establishment of either Sovietism or Communism."

এর পর Micheal Borodin ক্যাণ্টনে আসেন কুয়োমিণ্টাং এবং কম্যুনিস্ট দলের সম্মিলিত একটি দল সংগঠনের জন্য। ১৯২৪ সালে কুয়োমিণ্টাংয়ের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কম্যুনিস্ট পার্টির কোন অস্তিত্ব বা অংশ কুয়োমিণ্টাং সংগঠনে থাকবে না বা থাকল না। স্থির হল—

"Chinese Communists who were willing to take oaths of allegiance should be admitted to the Kuomintang on an individual basis."

ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন কম্যুনিস্ট দলের পরিচয় সাম্যবাদের মেক-আপ সত্ত্বেও জানতেন। ১৯২০ সাল থেকেই বলশেভিক রাশিয়ার দৌত্য কয়েকবারই তাঁর কাছে এসেছে, সাহায্য দিতে চেয়েছে। ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের তখন নিদারুণ দুঃসময়, চারিদিকে বিপদ, আত্ম-গোপনও করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি তবুও এই প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। অবশেষে তাঁর নির্ধারিত শর্তেই রাশিয়া সাহায্য দিতে রাজী হয়। সে শর্ত এই—

"If Russia wants to co-operate with China, she must co-operate with our party (Kuomintang), and not with Ch'en Tu-hsi (the C. P. C. leader). If Ch'en disobeys our party he will be ousted."

বলা বাহুল্য, তখন মাও সে-তুং এবং চৌ এন-লাই সম্মুখের সারিতে এসে পৌঁছননি।

ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং-কাইশেক হলেন কুয়োমিণ্টাং-এর কর্ণধার। চিয়াং-কাইশেক চীন দেশের দুর্ভাগ্য। নিজের দোষে স্বকীয় ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে চীনের জীবনে ডাঃ সান-

ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে ও সাধনায় মহত্ত্বপূর্ণ নবজীবনের যে মহৎ সম্ভাবনা ছিল, তাও ব্যর্থ হয়ে গেল উগ্র দাম্ভিক ক্রোধী স্বার্থপর নেতার জীবনের সঙ্গে। জাতির সর্বনাশ এইভাবেই হয়ে থাকে।

সমরবাদী চীনের একচ্ছত্রাধিনায়ক চিয়াং-কাইশেক উত্তপ্ত কঠাহ এবং সমরবাদী কম্যুনিস্ট দলগত ঐক্যের একচ্ছত্রাধিনায়ক মাও সে-তুং জ্বলন্ত বহ্নিকুণ্ড। চীনের জনগণের জীবন অগ্নিকাণ্ডের উপযুক্ত দাহ্য পদার্থ। সে শুধু নিজেই জ্বলে ক্ষান্ত নয়, চারিদিকের ভূখণ্ডে এই প্রজ্বলনকে প্রসারিত করাই তার স্বাভাবিক ধর্ম। থাক একথা এখন। ইতিহাসের কথাই বলি। ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের তিরোধানের সময়েই Whampon Militry Academy স্থাপিত হয়, চিয়াং হন তার সর্বময় কর্তা, এই অ্যাকাদেমিতেই চৌ এন-লাই ইউরোপ থেকে এসে একজন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষক নিযুক্ত হন। চীনের তথা বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে এই তাঁর প্রকাশ্য আবির্ভাব।

বছর তিনেকের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি জাতীয়তাবাদী কুয়োমিণ্টাং-এর পিছনে থেকে কিছুটা বলসঞ্চয় করে নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে গেল। ১৯২৮-৩০ সালে একটি কৃষক অভ্যুদয়ের প্রচেষ্টা এবং কৃষকদের হাতে অস্ত্র দিয়ে নগর অভিযানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল এই সময়। এর নায়ক ছিলেন—Li 'Li San। এই ব্যর্থতার পরই বলতে গেলে মাও সে-তুঙের অভ্যুদয়। কিয়াংসি প্রদেশে মাও সে-তুঙ একটি সোভিয়েট স্থাপন করে সেখানকার কৃষকদের নিয়ে গরিলা যুদ্ধে সফলতা লাভ করেন। সেখানকার জমি দখল করে নতুন শৃঙ্খলা এবং নতুন আইনের প্রবর্তন করেন। বলা বাহুল্য, বর্তমানের আইন এবং সে আইনে অনেক প্রভেদ। এবং তখনকার কৃষকদের সঙ্গে মাও সে-তুঙের ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হয়তো বা সেদিনের মাও সে-তুঙও স্বতন্ত্র। হয়তো কেন—নিশ্চিত রূপে স্বতন্ত্র। তখনকার মাও সে-তুঙ অবসর সময়ে কবিতা লিখতেন। শুনেছি তিনি কবি ছিলেন। এবং তাঁর চোখে তখন সাম্যবাদের নেশা ধরেছে। সাম্যবাদের সাধক

তখন তিনি। সাম্যবাদের সিদ্ধি তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে, কি করে তুলবে তা তিনি জানতেন না। আমাদের দেশে একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মায়ের নাম গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াতেন, সকলজনের সঙ্গে একটি মধুর সম্পর্ক ছিল। লোকে বলত পাগলা। তিনি সকলকে বলতেন ভাই। সবাই যে মায়ের সন্তান! তারপর কিছুদিন রাত্রে শ্মশানে শবসাধনা করে আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। ভয়ঙ্কর মানুষ। সামান্য ত্রুটিতেই ক্ষিপ্ত হয়ে কটুকাটব্য করতেন, লোককে প্রহার করতে যেতেন, অভিশাপ দিতেন। লোকে বলত তিনি সিদ্ধ হয়েছেন—সব দিতে পারেন। তিনি কিন্তু দু'চারজন একান্ত অনুগত ভক্ত ছাড়া সকলকেই শাপান্ত করতেন। তারা ছাড়া তাঁর কাছে ছিল সবাই পাপী। শাস্তির যোগ্য। সাধন মার্গে তাই হয়। সে ধর্ম, রাজনীতি সমাজনীতি যে কোন মার্গেরই সাধনা হোক না কেন।

তখনকার দিনের মাও সে-তুঙ নিষ্ঠার ফলে কিয়াংসি প্রদেশের সোভিয়েট চাষীদের সংগঠনে এবং তাদের নিয়ে গরিলা বাহিনীর কৃতকার্যতায় যে সফলতা অর্জন করলেন তারই ফলে ১৯৩১ সালে রুশিয়ার কমিণ্টার্নের নির্দেশে চীনের সকল স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন সোভিয়েট-গুলি যুক্ত হয়ে লাল সরকারের ভিত্তি পত্তন হল। রুশ দেশ প্রত্যাগত কতকগুলি ছাত্র অর্থাৎ শিক্ষিত যুবক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মাও চতুরতার সঙ্গে তাঁর শৃঙ্খলায় ও সংগঠনে কঠোরতা এবং মায়ামমতাহীনতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে চীন কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দখল করলেন।

আমাদের গ্রামের যে সাধকটির কথা বলেছি, তাঁর জীবনেও দেখেছি, তিনি যত কঠোর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতেন, ততই মানুষ তাঁর দিকে বেশী আকৃষ্ট হত। দলে দলে ছুটে যেত ভক্তি উপহার নিয়ে। তাঁর ভয়ঙ্করত্ব এবং কঠোরত্বই ছিল মানুষের কাছে সিদ্ধির মাপকাঠি।

মাও সে-তুঙের সাধনার উপর আমি কালির দাগ দিচ্ছি না;

তিনি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁর নেতৃত্ব কামনা ঠিক নিজের জন্য ছিল না। ছিল তাঁর সাধনা ও আদর্শের জন্য। এই কঠোরতা তিনি দেখিয়েছিলেন—তিনি সকল দুর্বলতাকে জয় করেছেন—এই প্রমাণ দেবার জন্য। সকল দুর্বলতা যে জয় করেছে গণিতের নিয়মেই সে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান।

এর পরই ইতিহাস-বিখ্যাত কম্যুনিস্টের অমানুষিক শৃঙ্খলা এবং শক্তির নিদর্শন—Long march লঙ মার্চ। পূর্বেই বলেছি কুয়োমিণ্টাংয়ের আশ্রয়ে বেড়ে-ওঠা কম্যুনিস্ট-পার্টি কুয়োমিণ্টাংয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। চিয়াং কাইশেক সম্পর্কেও পূর্বেই বলেছি—চিয়াং কাইশেক চিয়াং কাইশেক, ডাঃ সান-ইয়াত সেন নন; তিনি উগ্র অসহিষ্ণু কুটিল ভোগবাদী—এক কথায় জাতীয়তাবাদের পোশাক পরে চীনের সনাতন ক্ষমতাপিপাসু War Lord—সমর নায়ক। কৌশলসর্বস্ব, স্বার্থপর, একনায়কত্ব অভিলাষী; আদর্শ যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু কম্যুনিস্টরাও তাঁর বিরোধিতা করেছিল—কোনও আদর্শবশে করেনি। করেছিল কম্যুনিস্ট প্যার্টির প্রতিষ্ঠার পথে এই ক্রমবর্ধমান শক্তি কুয়োমিণ্টাং দল ও তার নায়ক চিয়াং কাইশেকের উচ্ছেদের জন্য। হিসাবে তারা ভুল করেনি। চিয়াং কাইশেকও কম্যুনিস্টদলকে ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে কিয়াংসি প্রদেশে কুয়োমিণ্টাং সরকার ধারাবাহিকভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে চীন কম্যুনিস্ট পার্টিকে সমূলে ধ্বংসের চেষ্টা করেছিলেন তাদের কুয়োমিণ্টাং শক্তির প্রতি অনানুগত্যের জন্য। এ থেকে বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল না কম্যুনিস্ট পার্টির। অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তোলে যে, সে মহা উন্মাদ। অথবা মহাউন্মাদনায় প্রবুদ্ধ উন্মাদ। মাও সে-তুঙ, তাঁর সমস্ত কম্যুনিস্ট দলবল, সৈন্য-সামন্ত সমরোপকরণ, এমন কি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, তার যন্ত্রপাতি গৃহস্থালীর সবকিছু এবং সর্বশেষ হলেও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল—প্রতিটি মানুষ, শিশুবালক, স্ত্রী-পুরুষ

সব নিয়ে চললেন ৬০০০ মাইল দূরবর্তী Northern Shenshi—উত্তর শেনসি।

পাঠান আমলে মহাপণ্ডিত (?) সুলতান মহম্মদ তোগলক্ একবার দিল্লীর তোগলকাবাদ থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। সেটি ইতিহাসে কালো দাগে চিহ্নিত হয়ে আছে। মাও সে-তুঙের ৬০০০ মাইল লঙ মার্চে সাধারণ চাষীর উৎসাহ এবং অভিপ্রায় কতটুকু ছিল তা জানেন সর্বান্তর্যামী আর জানেন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি এবং মাও সে-তুঙের দৃষ্টান্ত বিরল সাফল্যের জন্য তা ইতিহাসে উজ্জ্বল লাল কালি দিয়ে বিশেষরূপে চিহ্নিত করা আছে।

মাও সে-তুঙ—যিনি প্রথম যৌবনে কবি, যিনি প্রথম রাজনৈতিক জীবনে কিয়াংসির কৃষকদের আপনার জন—তিনি তখন মহাউন্মাদনায় উন্মাদ। একদিকে তাঁর মাথায় ভর করেছে প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে ভর করেছে কম্যুনিজম। একটি অপরের পরিপোষক। একটি যখন দুর্বল হয় অন্যটি তখন তাকে ঝাঁকি দিয়ে টেনে তুলে খাড়া করে। মায়ের কোলে শিশু মরে, পিতার কোলে পুত্র মরে, স্বামীর পাশে স্ত্রী মরে, স্ত্রীর অগ্রগামী স্বামী মরে—মাওয়ের চোখের জল আসতে আসতেই শুকিয়ে যায়। মরুক—ভাবীকালে স্বর্গ রচিত হবে চীনে। তার জন্য এসব মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। পঞ্চাশ ষাট কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য এ মৃত্যু এ তো বলি। এই মনোভাব এবং কম্যুনিজমের নির্দেশের আশ্রয়ের জোরেই কবি মাও সে-তুঙ পরবর্তীকালে অবাধ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন শ্মশানে শবসাধক উন্মাদের মত। ১৯৫৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহানায়ক মহামতি মাও তাঁর বক্তৃতায় একথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।—

The bloody campaign against counter-revolutionaries in 1951-52 was aimed not only at eleminating actual or suspected opponents of the regime but

at terrorising the rest of the populace into submission. The war on counter-revolutionaries has never entirely ceased, but it did quieten considerably for a time after 1952. In 1955 however it intensified once more although not on the original scale. In the original version of his speech on contradiction on February 27, 1957. Mao Tse-tung is supposed to have put the number of people actually executed as counter-revolutionaries through 1956 at 800,000. A much larger number were given less severe sentences mainly forced labour.

এই Forced labour-এর স্বরূপ পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত নয়। সারা কম্যুনিস্ট ছুনিয়াতেই এর অস্তিত্ব আছে। সাম্রাজ্যতন্ত্রে সামন্ততন্ত্রে বন্দীজীবনে মানুষ কারাগারের মধ্যে একদিন মরত। কিন্তু কম্যুনিস্ট ছুনিয়ার এই Forced labour বা বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে সে বন্দীকর্তাদের কাজে অমানুষিক শ্রম করে অর্ধাশনে হিমবাত্যায় পীড়িত হয়ে জীবনের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষে নিঙড়ে চোখ বুজে পরিত্রাণ পায়। তার থেকে হয়তো কাঠের উপর মাথা রেখে জহ্লাদের দা'য়ের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড হয়ে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। আট লক্ষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল ; তার থেকে অনেক বেশী সংখ্যক লোক বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে নির্বাসিত হয়েছিল। তাহলে সে সংখ্যা কত? দশ গুণ হলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।

যে স্বর্গ চীনে নবপরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে, যার জন্য লক্ষ লক্ষ বা কোটি মানুষের জীবন মহাবিকারে গৃহীত হয়েছে তার স্বরূপের একটি নিদর্শন তুলে দিচ্ছি—

"The result has been a campaign of virulent demigration of established standards and way of life.

in particular house work and small family. An outstanding example of this was "the Letter to a complaining husband, on a Sunday morning" in the People's daily of 6th July, 1958 in which a house wife writes—

"This type of big family is different from that which we had in the past, she said. It is a new type of revolutionary family—a unit, an organisation, a factory, a form of co-operative. We also have a larger revolutionary big family such as city or a district.

The small family involves the relation between husband and wife, parents and children, the house wife added. But the big family is saturated with revolutionary comradeship, consideration for one another and selfless help given to one and all....I think even the least small family is no match for this home. Don't you think so ?

The husband's answer is not recorded."

ছোট ঘর থেকে বড় ঘর, ছোট প্রেম থেকে বিশ্বপ্রেম। শুনতে কথাটা মনোরম। অপূর্ব। কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে উইপোকার সভ্যতায় যেতে হবে। প্রকৃতির নির্দেশে এ পরীক্ষা করে প্রাণ দেউলে হয়ে ও-পথ ত্যাগ করেছে। শীতের বাদলার সময় রক্তসন্ধ্যার ছটা দেখে উইটিপি থেকে পাখা-ওঠা উইপোকার মরণ অভিসার অনেকেই দেখেছেন, আমিও দেখেছি। মানুষের পাখা গজাবে না। তাকে মরতে হবে এইভাবে। যুদ্ধে। হুকুম আসবে—লোক বেশী হয়েছে, খাদ্যাভাব ঘটেছে। যাও, মর গিয়ে। পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্রসর হও। মানুষের তৈরি আণবিক

অস্ত্রও পরাস্ত হবে। প্রেম ভক্তি স্নেহ ছোট ঘরের অমূল্য সম্পদ যা কিছু সব ধ্বংস হয়ে যাবে, ছোট ঘর বিলুপ্তির সঙ্গে। মস্তিষ্ক চিন্তা সব ভোঁতা হয়ে যাবে। হাতের কর্মকুশলতা বাড়বে। মানুষ যন্ত্র হয়ে যাবে। মাথার উপরে কোটি কোটি পঁয়ষট্টি সত্তর কোটি লোকের মস্তিষ্ক স্তব্ধ হয়ে কানকে সজাগ করে রাখবে হয়তো বিশ জন মানুষের কথা শোনবার জন্য। বিশ জনও শুনবে একজনের কথা। কিন্তু তিনি কি চিরজীবী? না চিরজীবী নন। তবে তাঁর দেহকে অবিকৃত করে রাখা যাবে।

থাক এখন একথা।

কুয়োমিণ্টাং-এর সঙ্গে এই বিরোধের আবার আপস হল। জাপানী আক্রমণের সময় হল এই আপস। চিয়াং কাইশেক 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' নীতি অবলম্বন করে চীনা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপস করে তাদের ঠেলে দিতে চাইলেন জাপানীদের যুদ্ধ লাইনের সম্মুখে। ভাবলেন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের চিন্তা পৃথিবীর গতি আকস্মিক সংঘটন—এর আর একজন মালিক আছেন বলেই অনেকে মনে করেন। আমিও করি। কিন্তু তাও যদি সত্য না হয় তবে বিচিত্র আকস্মিকতায় ঘড়ির কাঁটা দম থাকতেও আটকে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটে। জাপানীদের ঘড়ি বড় বেশী জোরে ছুটেছিল। তার ফল চিয়াং কাইশেকের সব হিসেব গরমিল করে দিলে। ফল যেখানে হবার কথা বিযুক্ত এক—সেখানে ফল দাঁড়াল যুক্ত এক।

পাঁচ

মার্শাল চিয়াং কাইশেক রাজনৈতিক কুটিল—'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' সূত্রটি ধরে সেদিন অঙ্ক কষে যে উত্তরটিকে স্থির নিশ্চয় বলে মনে করেছিলেন, তা উল্টো হয়ে মিথ্যা হয়ে গেল। তাঁর ভাগ্যকে দোষ

দেব না, তাঁর কর্মকে দোষ দেব। সংসারে বুদ্ধিবাদীরা এমন ক্ষেত্রে যেখানেই চতুরতাকে সর্বস্ব করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে পড়েন, সেইখানেই ঠকেন। জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি কম্যুনিস্টদের সামনে ঠেলে দিলেন, তাতে ফল হল এই যে কম্যুনিস্টরা সাধারণ মানুষের কাছে পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়াল। এবং নিজেদের সামরিক সংগঠনকে দৃঢ়তর করে তুলতে সুযোগ পেল এবং সক্ষম হল। এরপর যখন অ্যাটম বোমার আঘাতে ও অন্যান্য কারণে অক্ষশক্তির আকস্মিক পতনে বিশ্বপরিস্থিতিতেও যে পরিবর্তন ঘটল, তা যেমন কল্পনাতীত তেমনি আকস্মিক। তখন কম্যুনিস্টরা তাদের সেই দৃঢ় সংগঠিত শক্তি মুহূর্তে ঘুরিয়ে কুয়োমিণ্টাংয়ের উপর প্রয়োগ করতে পারল সার্থকভাবে। তাতেই মার্শালের নির্ধারিত অঙ্কফল যুক্ত এক হয়ে দাঁড়াল বিযুক্ত এক। শত্রুকে তিনি ক্ষুদ্র দেখে অবজ্ঞা করলেন, এবং কম্যুনিস্ট সংগঠনকে তিনি খুব সম্ভব চিনতে চাননি। সমরোপ-করণে সুসজ্জিত তাঁর সৈন্যদলের বিরুদ্ধে কিছু ভাঙা অস্ত্র সম্বল, শুধু মাত্র অন্নবস্ত্রের প্রলোভনে প্রলুব্ধ বুদ্ধিহীন বিক্ষোভ ও হিংসাসর্বস্ব জনতার সংগঠনকে তিনি পিঁপড়ে ভেবেছিলেন। পিঁপড়েই হয়তো বটে। কিন্তু পৃথিবীর মাটির ঢিবির মধ্যে এমন পিঁপড়ের সংগঠন আছে যাদের সামনে বড় বড় হাতী, এমন কি হাতীর পাল পড়লেও তাকে আচ্ছন্ন করে এই পিঁপড়ের দল এবং লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ের প্রাণের বিনিময়ে কোটি কোটি পিঁপড়েরা এই হাতীদের মাংসের ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত হয়ে এগিয়ে চলে। পিছনে ফেলে রেখে যায় কতকগুলি হাতীর কঙ্কাল। চীনা প্রকৃতি এবং কম্যুনিজমের সমন্বয়ে যে বিচিত্র সঙ্ঘশক্তি গঠিত হয়েছে তার তুলনা বোধ করি এক এদের সঙ্গেই হয়। প্রলোভনের মত মাদক আর নেই। আবার তার সঙ্গে যদি হিংসা চরিতার্থ করবার উগ্রবিষ মিশ্রিত হয় তবে তার ক্রিয়াতে মানুষ প্রমত্ত নয়, উন্মত্ত হয়। এর সঙ্গে আরও কিছু আছে। একটি কল্পিত সর্বজনের সুখস্বর্গের স্বপ্ন আছে। যে স্বর্গে

দেবতা নেই। দেবতাদের শূন্য আসনগুলি মানুষদের দেখানো হয় তোমাদের জন্য। কিন্তু তারা দেখতে পায় না, আরও একটি পর্দার অন্তরালে থাকে কয়েকজন কম্যুনিস্ট নেতা, যারা ঈশ্বরের চেয়েও নির্বিকার। চীনের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার সুদীর্ঘকালের বিশাল জনসংখ্যা বলে যুদ্ধনীতির ঐতিহ্য ও অভ্যাস।

যাক। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীন উপমহাদেশে কম্যুনিস্ট গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা দিবস। মার্শাল চিয়াং কাইশেক কোন রকমে আত্মরক্ষা করে তাইওয়ানে তাঁর পক্ষের সমরনায়ক, সৈন্যদল এবং স্বপক্ষীয় বিশিষ্ট লোকজনদের নিয়ে চলে এলেন। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, তার নাম হল 'পিপ্‌ল্‌স রিপাবলিক অব চায়না'—চীনের জনগণের সাধারণতন্ত্র।

সেদিন পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি অবশ্যই শঙ্কিত হয়েছিল। তার কারণ কম্যুনিজমকে তারা আমাদের অপেক্ষা নিকটতর সান্নিধ্য থেকে দেখেছে এবং চিনেছে। দ্বিতীয় কারণ, এসিয়াবাসী অপেক্ষা তারা বাস্তববুদ্ধিতে কূটনৈতিক বিচারে অনেক বেশী দক্ষ। তৃতীয় কারণ, কম্যুনিস্ট ইয়োরোপ বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলি সাম্রাজ্য উপনিবেশ এবং বাণিজ্যমুখে শোষণের সম্পদের উপরেই নির্ভরশীল। শঙ্কা তাদের হবারই কথা। কিন্তু এসিয়ার দেশগুলি উল্লসিত হয়েছিল। এর কিছুদিন পূর্বেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। চীন সমরনায়কদের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ তাদের চোখে এক আশ্চর্য মুক্ত জীবন-স্বপ্নের সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর শোষিত এবং পরপদানত দেশগুলিতে কম্যুনিজম সম্পর্কে যে মোহ ছিল, সে মোহ রাশিয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির যত কিছু প্রচার তার প্রায় সবটাই এসিয়া আফ্রিকা অবিশ্বাস করেছে। সব কিছুকেই নিছক প্রচার বলে ধরে নিয়েছে। এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি এসিয়া আফ্রিকার দেশগুলিতে বাণিজ্যোপকরণের

আড়ালে রণসম্ভার বহন করে এনে তাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিষ্ঠুর শোষণে প্রায় সর্বরিক্ত করে ফেলেছিল। তাদের অন্ন, তাদের বস্ত্র, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ধর্ম, তাদের মর্যাদা, তাদের ইজ্জত—সব কিছুকে কেড়ে নিয়ে যা নেবার নিয়েছে; যা নেবার নয়, নেওয়া যায় না, তা পদদলিত করে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তারা যাকেই মন্দ বলেছে তাকেই শোষিতজনেরা ভাল বলে মনে করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, স্বর্গীয় অমলেন্দু দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ডেটেনিউ'য়ের একটি অংশ। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ব্যর্থ বলেই প্রমাণিত হল। সমস্ত সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা তখন তখনকার দিনের নিরাপত্তা আইনবলে বক্সা এবং দেউলীতে প্রাচীনকালের দুর্গাভ্যন্তরে দলবদ্ধভাবে আটক বন্দী হিসাবে বাস করছেন। প্রায় সামরিক ব্যবস্থার মত ব্যবস্থা। তারই মধ্যে তাদের আলোচনা চলছে কঃ পন্থা? কোন্ পথে ভারতের স্বাধীনতা আসা সম্ভবপর! ইয়োরোপের ইতিহাস সন্ধান করছেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন ১৯১৮ সালে সংঘটিত রুশ বিপ্লবই তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। আকৃষ্ট অবশ্য বিপ্লবের পর থেকেই করেছে। মার্ক্সবাদ ক্যাপিটাল গ্রন্থ বহু জন অধ্যয়ন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি শাস্ত্রের ছাত্রসংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। রুশসাহিত্যে কুপরিন চেকভ দস্তয়ভস্কি তুর্গেনিভ—এমন কি মহাত্মা তলস্তয়ের রচনা থেকেও গর্কীর রচনা আমাদের বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্যে কিছু কিছু সাম্যবাদের আবেগধর্মী রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই বাদকে আমাদের দেশের মাটিতে এবং জীবনে তখনও গ্রহণ করিনি। কোন সংগঠনও ঠিক গড়ে ওঠেনি। তখনই এই বন্দীশিবির দুটিতে আলোচনার ফলে একদল কর্মী মার্ক্সবাদকে জীবনে গ্রহণ করলেন। বললেন, রাশিয়ার অনুকরণে মার্ক্সবাদসম্মত গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সার্থক হবে বিপ্লব। এবং মার্ক্সবাদী সমাজ গঠনের মধ্যেই হবে

গণজীবন সার্থক। এর বিরোধী দলও ছিল এবং তাঁরা প্রবল ও সংখ্যায় অধিক ছিলেন। দাশগুপ্ত মশায় লিখেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা তখন সব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি সব—সবই তাঁরা ফেলে দিয়ে সেই মুক্ত হাতে মার্ক্সবাদসম্মত রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেবার জন্য অধীর হয়ে উঠে গ্রহণ করলেন এই রাজনৈতিকবাদ। তখনও এ আদর্শের আসল সত্য ও স্বরূপ অনুপলব্ধ। তারপরও কিছু কাল এই দলের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির মূল প্রেরণা শুধুই বিপ্লব ও স্বাধীনতালাভের আবেগ। সে আবেগ সৎ, সে আবেগ শুদ্ধ। সে আবেগ মহত্ত্বের জন্য আবেগ। আজও এই আবেগ কাজ করে থাকে। বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, এই বাদ ছাত্রজীবনের আদর্শ আকাঙ্ক্ষার প্রেরণার ফলেই আসক্ত তরুণেরা গ্রহণ করে থাকেন। পরে যখন এই সত্য, এই বাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়, তখন দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ফলে এর মন্দ দিকটা বোঝবার শক্তিও আর থাকে না। এর পরের স্তর যেটা, যে স্তরে এই বাদের ভয়ঙ্করত্ব নখদন্ত বিস্তার করে, আক্রমণ করে, সে স্তর এখনও এদেশে আসেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক পূর্ণ অধিকারের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় কম্যুনিজম, ততক্ষণ সেই সময় বা স্তর আসে না। সে অবস্থা যখন আসে তখন ট্রটস্কি পৃথিবীর অপর প্রান্তে গিয়েও নিষ্কৃতি পান না। তখন বড় বড় নেতারা অধিনায়কের নির্দেশে অপরাধ স্বীকার করে দণ্ডিত হন। তখন স্টালিনের শবদেহ লেনিনের শবদেহের পাশের সম্মানিত স্থান থেকে নির্বাসিত হয়ে ক্রেমলিনের প্রাচীর প্রান্তে মাটির তলায় নির্বাসিত ও কবরস্থ হয়ে মাটিতে মেশবার প্রতীক্ষা করে।

১৯৪৯ সালে ১লা অক্টোবর যেদিন চীনে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল সেদিনও সমগ্র এসিয়ার মানুষের চোখে এই স্বপ্ন। একটি সুখী এবং মুক্ত স্বচ্ছন্দ জীবন-সমৃদ্ধ এসিয়ার স্বপ্নই তারা দেখেছে। সে দিনও এই স্বপ্নের সঙ্গে মিশে আছে পাশ্চাত্ত্যের

শোষক এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ। সে বিদ্বেষ ন্যায্য স্বাভাবিক এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ কামনার প্রেরণায় প্রবুদ্ধ। অবশ্য আমাদের ভারতবর্ষে এবং এসিয়ার অন্য কয়েকটি দেশে তখন সেসব দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এক অতি অবাঞ্ছিত দেশদ্রোহিতার অপ্রিয় কর্ম করতে বাধ্য হয়েছেন, নিজেরা মনে মনে পীড়িত হয়েছেন, হয়তো দেশের কাছে নিন্দিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের এ কাজ না করে উপায়ান্তর ছিল না। তবুও মানুষের মোহ কাটেনি। এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক, না বললে এতকাল পরে সে অবস্থাটি ঠিক পরিস্ফুট হবে না। সে কথা কটি এই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে। ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। বিনা রক্তপাতে (ইংরেজের সঙ্গে শেষ রক্তপাত-মূলক সঙ্ঘর্ষ হয়নি।) এই স্বাধীনতা লাভ এসিয়া ও পৃথিবীর দেশগুলিতে যথোপযুক্ত উত্তেজনা ও উল্লাস সৃষ্টি করতে পারেনি। ভারতবর্ষের অহিংস স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর কোন দেশই সঠিক বুঝতে পারেনি। অপর পক্ষে ইংরেজের এই সাম্রাজ্য ত্যাগের মধ্যে মহত্ত্ব দূরে থাক, কোন দূরদর্শিতার পরিচয়ও কেউ খুজে পায়নি। এই সাম্রাজ্য ত্যাগকে তারা এক জটিলতর নতুন শৃঙ্খল বন্ধন বলে সন্দেহ করেছিল। শুধু ইংরেজই নয়, এ দেশের নায়ক মহাত্মা এবং তাঁর সহকর্মী শ্রীজওহরলাল প্রভৃতিও সে সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

এই সুযোগ আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিও ছাড়েনি। তাঁদের দলের কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ আকাশস্পর্শী 'আওয়াজে' সে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' আন্দোলন আজও কেউ বিস্মৃত হননি। সব দেশেই এ আওয়াজ তুলেছিল কম্যুনিস্টদল। সুতরাং ১৯৪৯ সালে সশস্ত্র বিপ্লবে পরদেশী সাহায্যপুষ্ট কুয়োমিণ্টাং সরকারের উচ্ছেদ ও জনগণের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহত্তম ও গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা হিসাবেই (প্রথম ঘটনা ১৯১৮ সালে রাশিয়ার বিপ্লব ও

কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা) পৃথিবীতে চাঞ্চল্য উল্লাস সৃষ্টি করেছিল। কম্যুনিজমের তত্ত্বে এ কথা লেখা আছে কি না সঠিক জানি না, তবে একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে, কোন দেশে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র শুধু স্বদেশের অস্ত্রশক্তি ও সংগঠনের দ্বারাই সার্থক এবং পূর্ণ হয় না, দেশের গণ্ডীর বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির আকাশস্পর্শী সাধুবাদের শব্দাগ্রের সাহায্যও তাতে শক্তির সংযোজন করে। অন্যদিক থেকে, প্রতিদানে প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র থেকে রাজনৈতিক অধিকারে প্রতিষ্ঠাকামী অন্য দেশী কম্যুনিস্ট পার্টিগুলিও শক্তি সঞ্চয় করে পুষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচার সাহায্য তো বটেই, তা ছাড়াও আর্থিক সাহায্যও আসে নানাভাবে বলে শুনেছি। এ ছাড়া, অকম্যুনিস্ট দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শক্তিশালী ব্যক্তিদের সে দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশ মত বাছাই করে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে নানা সম্মানে, নানা সমাদরে আপ্যায়িত এবং মোহগ্রস্ত করে ফিরিয়ে পাঠায়। তাঁরা স্বদেশে কম্যুনিজমের উগ্র প্রচারক হয়ে ওঠেন।

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনে Peoples' Republic of China প্রতিষ্ঠার দিন অকম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের অভিনন্দন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, চীনের প্রতিবেশী ভারতবর্ষ। সুতরাং এতে চীন সেদিন দক্ষিণ সীমান্ত সম্পর্কে হল নিশ্চিন্ত। বিশাল ভূখণ্ড চীন উপমহাদেশ। সুবিস্তীর্ণ তার সীমান্ত। সে সীমান্তের পশ্চিম এবং উত্তরে সোভিয়েত রাশিয়া। পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর। দক্ষিণে ভারতবর্ষ, তিব্বত, (তিব্বতের দক্ষিণে নেপাল) ব্রহ্মদেশ, ভিয়েৎনাম। ভারতবর্ষই সর্বাধিক স্থান জুড়ে আছে। প্রশান্ত মহাসাগরেই তার মহাভয়। তাইওয়ানে চিয়াং কাইশেক এবং জাপানে ও প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সৈন্যবল ও নৌবল। ইন্দো-চায়নায় ইয়োরোপীয় শক্তির প্রভাব এবং ব্রহ্মদেশে তখনও ইংরেজ এবং অক্ষশক্তি সমর্থক প্রচ্ছন্ন

গুপ্ত শক্তি। সুতরাং সেদিন দক্ষিণ সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করলে যে ভারতবর্ষের অভিনন্দন তার মূল্য বিচার করতে গেলে বলতেই হবে তার মুল্য রাশিয়ার অভিনন্দনের পরবর্তী মূল্য।

এরই মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে সেই জীবন-ধাতুর কথা!

ভারতবর্ষ তার জীবনধাতু ও অতীত সংস্কৃতির ভিত্তির উপর গঠিত নতুন জীবনাদর্শ অনুযায়ীই পাঠালো অকপট অভিনন্দন। শুধু অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তাকে স্বীকার করেছিল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপনও করেছিল।

চীনও সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে বললে—আমরা ছিলাম পুরাতনকাল থেকে বন্ধু। এখন হলাম ভাই। সেদিন মনে হয়েছিল এ হস্ত প্রসারণ এবং ভ্রাতৃসম্বোধন তার অকপট। আজ সন্দেহ হয়। দৃঢ় সন্দেহ!

এই ভ্রাতৃত্বের অর্থ সম্ভবত সেদিনও ছিল কম্যুনিস্ট দলসম্মত ভ্রাতৃত্ব। চীনের পরবর্তী আচরণসমূহের মধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। তাতেও যাঁরা সন্দেহ করবেন, তাঁদের জন্যই হিমালয় রণাঙ্গনে যুদ্ধরত চীনা সৈনিকদের, ভারতীয় সৈন্যদের 'বাই—বাই' সম্বোধনের কথা স্মরণ করিয়ে দেব। .এই 'বাই' সম্বোধন কিসের জন্য? তোমরা কম্যুনিস্ট হয়ে যাও। চীনকে প্রধান স্বীকার কর।

এখানে কঠোর নিরপেক্ষ সমালোচনার দাবীতে কতক সমালোচক যে কথাগুলি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলে থাকেন, সেগুলিরও উল্লেখ এবং বিচার না করলে সত্যে ঠিক উপনীত হওয়া যাবে না।

অনেকে পণ্ডিত নেহরুর এবং ভারত সরকারের এই অভিনন্দন জানানোর ও রাষ্ট্রসঙ্ঘে নয়াচীনকে আসন দানের প্রস্তাব উত্থাপন এবং সমর্থনের ব্যাখ্যা করে থাকেন অন্য প্রকার। এর মধ্যে তাঁরা শ্রীনেহরু এবং ভারত সরকারের কূটনীতিকেই দেখে থাকেন।

তাঁরা কূটনৈতিক অনুবীক্ষণে সমস্ত পরীক্ষা করে এই ব্যাখ্যা করে থাকেন যে, ১৯৪৬।৪৭ সালে কুয়োমিণ্টাং সরকারের সর্বাধিনায়ক

মার্শাল চিয়াং কাইশেক এবং তাঁর দৃষ্টান্তে তিব্বত (ও তার নায়ক বর্তমান দালাই লামা) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আসন্ন বুঝে চীন তিব্বত-ভারতবর্ষ-সীমান্ত ম্যাকমেহন লাইনকে অস্বীকার করে কয়েক দফায় যে দাবী জানিয়েছিলেন, সেই দাবীতে (তৎকালীন পাকিস্তান এবং গৃহ-সংঘর্ষে বিব্রত ভারতবর্ষ এবং মহাত্মার তিরোধানে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিহ্বল শ্রীনেহরু) বিব্রত হয়েই এই নতুন দাবীর বিরোধ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন—এই প্রত্যাশায় চীনের এই পরিবর্তনকে এমন আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করে কম্যুনিস্ট সরকার ও মাও সে-তুঙ চৌ এন-লাইকে স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন। ভেবেছিলেন কম্যুনিস্ট সরকার বিনিময়ে ম্যাকমেহন লাইন স্বীকার করে নেবে।

এইটেই কি সত্য ?

একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

১৯৪৯ সাল। তার পূর্বেই ভারতবর্ষ তিব্বতের উপর থেকে তিব্বতেরই দাবী অনুযায়ী ইংরেজ আমলের যে-সব বিশেষ অধিকার ছিল, তা সবই ত্যাগ করেছে। এখানে শ্রী কে এম পানিক্করের উক্তি তুলে দিচ্ছি। চীনের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

"The only area where our interests overlapped was in Tibet, and knowing the importance that every Chinese Government, including Kuomintang had attached to exclusive Chinese authority over that area, I had, even before I started for Peking, come to the conclusion that the British policy (which we are supposed to have inherited) of looking upon Tibet as an area in which we had special political interest could not be maintained. The Prime Minister

had also in general agreed with this view." (In two Chinas, K. K. Panikkar.)
অর্থাৎ শ্রীনেহরু ঠিক রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিকে এবং চতুরতাকে তাঁর জীবনে বড় স্থান কোন দিনই দিতে চান না। সেদিনও চাননি। তিনি তাঁর বক্তৃতাতে বলেছিলেন—

"The Government of India hoped that Tibet would be allowed to maintain the autonomy it has had for at least forty years." (Nehru's speech 1950)

আদর্শবাদের ক্ষেত্রে এর মূল্য অনেক। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিশ্বাস এবং দিবাস্বপ্নে প্রভেদ নেই। এর জন্য যে কঠিন মূল্য দিতে হয়, তা ব্যক্তির পক্ষে দেওয়াই সম্ভবপর, জাতির পক্ষে তা অসম্ভব। ব্যক্তি জীবন দিয়েও মূল্য দিতে পারে, গান্ধীজী দিয়েছেন, কিন্তু জাতি তা পারে না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে অহিংসাকে রক্ষা করতে গিয়ে হিংসার সঙ্গে বারবার সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন এই কারণেই। নিজের জীবনক্ষেত্রে হলে তা তিনি করতেন না এটা নিশ্চিত। বারবার দেশের অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহ-অহিংস আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি তাদের দাবী মানেননি। কিন্তু যেখানেই আন্দোলন হিংসাত্মক হয়েছে সেখানেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করেছেন, দাবী মেনেছেন। প্রদেশ-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন, ভাষার দাবীর প্রশ্ন, এমন কি এই NEFA-র প্রশ্নের ক্ষেত্রেই সে মর্মান্তিক সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। তবে তিব্বতের ক্ষেত্রে আরও একটা কথা বলার আছে। সেটি হল এই যে, ১৯০৬ সালের Convention-এ বৃটিশ সরকারই তিব্বতের উপর চীনের অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এবং ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন থেকে বৃটিশ শাসনশৃঙ্খল মুক্ত হয়েছে, তখন থেকেই তিব্বতও যখন ভারত সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে কুয়োমিণ্টাং সরকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার এলাকা দাবী করে বিপজ্জনক রাজনৈতিক খেলা শুরু

মার্শাল চিয়াং কাইশেক এবং তাঁর দৃষ্টান্তে তিব্বত (ও তার নায়ক বর্তমান দালাই লামা) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আসন্ন বুঝে চীন তিব্বত-ভারতবর্ষ-সীমান্ত ম্যাকমেহন লাইনকে অস্বীকার করে কয়েক দফায় যে দাবী জানিয়েছিলেন, সেই দাবীতে (তৎকালীন পাকিস্তান এবং গৃহ-সংঘর্ষে বিব্রত ভারতবর্ষ এবং মহাত্মার তিরোধানে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিহ্বল শ্রীনেহরু) বিব্রত হয়েই এই নতুন দাবীর বিরোধ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন—এই প্রত্যাশায় চীনের এই পরিবর্তনকে এমন আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করে কম্যুনিস্ট সরকার ও মাও সে-তুঙ চৌ এন-লাইকে স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন। ভেবেছিলেন কম্যুনিস্ট সরকার বিনিময়ে ম্যাকমেহন লাইন স্বীকার করে নেবে।

এইটেই কি সত্য ?

একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

১৯৪৯ সাল। তার পূর্বেই ভারতবর্ষ তিব্বতের উপর থেকে তিব্বতেরই দাবী অনুযায়ী ইংরেজ আমলের যে-সব বিশেষ অধিকার ছিল, তা সবই ত্যাগ করেছে। এখানে শ্রী কে এম পানিক্করের উক্তি তুলে দিচ্ছি। চীনের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

"The only area where our interests overlapped was in Tibet, and knowing the importance that every Chinese Government, including Kuomintang had attached to exclusive Chinese authority over that area, I had, even before I started for Peking, come to the conclusion that the British policy (which we are supposed to have inherited) of looking upon Tibet as an area in which we had special political interest could not be maintained. The Prime Minister

had also in general agreed with this view." (In two Chinas, K. K. Panikkar.)
অর্থাৎ শ্রীনেহরু ঠিক রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিকে এবং চতুরতাকে তাঁর জীবনে বড় স্থান কোন দিনই দিতে চান না। সেদিনও চাননি। তিনি তাঁর বক্তৃতাতে বলেছিলেন—

"The Government of India hoped that Tibet would be allowed to maintain the autonomy it has had for at least forty years." (Nehru's speech 1950)

আদর্শবাদের ক্ষেত্রে এর মূল্য অনেক। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিশ্বাস এবং দিবাস্বপ্নে প্রভেদ নেই। এর জন্য যে কঠিন মূল্য দিতে হয়, তা ব্যক্তির পক্ষে দেওয়াই সম্ভবপর, জাতির পক্ষে তা অসম্ভব। ব্যক্তি জীবন দিয়েও মূল্য দিতে পারে, গান্ধীজী দিয়েছেন, কিন্তু জাতি তা পারে না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে অহিংসাকে রক্ষা করতে গিয়ে হিংসার সঙ্গে বারবার সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন এই কারণেই। নিজের জীবনক্ষেত্রে হলে তা তিনি করতেন না এটা নিশ্চিত। বারবার দেশের অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহ-অহিংস আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি তাদের দাবী মানেননি। কিন্তু যেখানেই আন্দোলন হিংসাত্মক হয়েছে সেখানেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করেছেন, দাবী মেনেছেন। প্রদেশ-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন, ভাষার দাবীর প্রশ্ন, এমন কি এই NEFA-র প্রশ্নের ক্ষেত্রেই সে মর্মান্তিক সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। তবে তিব্বতের ক্ষেত্রে আরও একটা কথা বলার আছে। সেটি হল এই যে, ১৯০৬ সালের Convention-এ বৃটিশ সরকারই তিব্বতের উপর চীনের অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এবং ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন থেকে বৃটিশ শাসনশৃঙ্খল মুক্ত হয়েছে, তখন থেকেই তিব্বতও যখন ভারত সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে কুয়োমিণ্টাং সরকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার এলাকা দাবী করে বিপজ্জনক রাজনৈতিক খেলা শুরু

করেছিল তখন চীনকে দূরে রাখবার বা চীনের আগমন রোধ করবার মত পথ ভারতবর্ষের সম্মুখে ছিল না। একমাত্র পথ হয়তো ছিল তিব্বতের প্রশ্ন এবং ভারত-চীন সীমান্ত প্রশ্ন একসঙ্গে মিটিয়ে তবে কোন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা, কিন্তু তা ভারতবর্ষ করেনি। সত্যের দিক থেকে সে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ইতিহাস আগামীকালে আজকের কর্ণধারগণকে নিশ্চয় দায়ী করবেন। কিন্তু সেখানেও চীনের কিছু বলবার নেই। তার অপরাধের স্খালন তাতে হয় না, হতে পারে না। অবশ্য একাধারে কম্যুনিস্ট আদর্শাশ্রয়ী ও প্রকৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী চীন এজন্য লজ্জিত বা সঙ্কুচিত কখনই হবে না। তার পক্ষে এ স্বাভাবিকই নয়।

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর যে চীন সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর গৃহযুদ্ধ ও জাপানী যুদ্ধের পর উঠে দাঁড়াল—এই নবগঠনতন্ত্র ঘোষণার দিন যার অবস্থা প্রায় দেউলিয়া অবস্থা (চিয়াং কাইশেক চীনের সমস্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে ফরমোজায় চলে যেতে পেরেছিলেন।) সেই চীন বিচিত্রভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যে কোরিয়া-ভিয়েৎনাম-কুয়েময়-তিব্বত-সিংকিয়াং এবং হিমালয় লঙ্ঘন করে ভারতবর্ষ আক্রমণের শক্তি অর্জন করেছে, এ বিস্ময়কর সত্য সম্ভবপর হয়েছে চীনের সেই জীবনধাতু এবং কম্যুনিজমের মাও সে-তুঙের ভাষ্য অনুযায়ী এক অমানুষী দানবীয় পন্থাবলম্বনের ফলে।

মাও সে-তুঙের যে ঘোষণার কথাটি পূর্বে একবার উল্লেখ করেছি—তার উল্লেখ আর একবার করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—

"The era of war will be ended with our hands. If we do not hoist the banner of the revolutionary war a greater part of the human race will face destruction. ....The most honoured career to save mankind."

এ আদর্শ এবং এই তত্ত্বে 'হয়তো' মাও সে-তুঙের বিশ্বাস ধ্রুব তারকার মত স্থির। যা দেবী ভ্রান্তিরূপেণ সর্বভূতেষু সংস্থিতা—এর মধ্যে

তাঁকেই প্রণাম করতাম ; পূর্বের ছত্রে 'হয়তো' শব্দটি ব্যবহারই করতাম না, কিন্তু তা আজ আর পারছি না। পারছি না এই হেতু, যেহেতু মাও আজ কম্যুনিস্ট জগতে সর্বোচ্চ নায়কের পদের জন্য রাশিয়ার ক্রুশ্চেভের প্রতিদ্বন্দ্বী। এরই মধ্যে আজ তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ বিদ্বেষবিকৃত স্বরূপ নিয়ে বাইরে এসে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। মাও সে-তুঙ এবং ক্রুশ্চেভের বিরোধ আজ কম্যুনিজমের উচ্চকণ্ঠে আওড়ানো জনকল্যাণের সমস্ত প্রগল্‌ভতাকে মিথ্যা প্রতারণা বলেই প্রমাণিত করে দিলে। আজ বাস্তবতার মধ্যে কম্যুনিজম বহু জন-কল্যাণের আশ্বাসের আবরণে একদল চতুর কুটিল ব্যক্তির বিশ্বগ্রাসের তন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। আরও প্রমাণ আছে, যা এর সাক্ষ্য দেবে।

পূর্বে বলেছি—১৯৪৯ সালে ১লা অক্টোবর চীনে কম্যুনিস্ট পার্টির অধিকার ঘোষিত হল। তারা জনগণের সাধারণতন্ত্র গঠন করলেন। মাওয়ের ঘোষণার কথা বলেছি। তার গৌরবান্বিত দায়িত্ব কম্যুনিস্ট পার্টির। কম্যুনিজমের। তবুও বিশ্ব-জগতের কাছে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সাহায্যে একাধিকনায়কত্বের সত্যটি গোপনের জন্য আটটি শক্তিহীন পঙ্গু রাজনৈতিক দলকে পুতুলের মত সাজিয়ে রাখলেন। আজও রেখেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশগুলিই আবার কম্যুনিস্টদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

(১) চীনা ডেমোক্রেটিক লীগ (২) রেভেলিউশনারী কমিটি অব কুয়োমিণ্টাং, (৩) তাইওয়ান ডেমোক্রেটিক সেলফ গভর্নমেণ্ট লীগ, (৪) চীনা ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন অ্যাসোসিয়েশন, (৫) চীনা অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রমোটিং ডেমোক্রেসী, (৬) চাইনিজ পেজেণ্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স ডেমোক্রেটিক পার্টি, (৭) চিউ সান সোসাইটি, (৮) চীনা চী-কুঙ-টাঙ।

এর মধ্যে ২ ও ৩ সংখ্যক দল—রেভেলিউশনারী কমিটি অব কুয়োমিণ্টাং ও তাইওয়ান ডেমোক্রেটিক সেলফ গভর্নমেণ্ট লীগ কম্যুনিস্ট পার্টিরই দুটি শাখা, কম্যুনিস্ট পার্টিই গড়ে রেখেছে। তাইওয়ান বা

ফরমোজার উপর দাবিদার দল হিসেবেই এরা কাজ করে যায়। চার-সংখ্যক দলটিও তাই। দেশের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নিয়ে এদের হাতেই দেওয়া হয়েছিল। ৫।৬।৭ সংখ্যক দল তিনটি—দেশের শিক্ষক ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বুদ্ধিবাদীদের নিয়ন্ত্রিত ও দলভুক্ত করার জন্য কাজ করে থাকে। এ-দেশে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মত।

রাশিয়া এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র সংগঠনের চেহারা প্রায় একই রকম। কিন্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রে চীনের কৌশলপরতন্ত্রতা ও কূটবুদ্ধি অন্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র; তাকে চীনাতন্ত্রই বলা চলে। এই স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য তার রাষ্ট্রনৈতিক ঐতিহ্যগত এবং জীবনধাতুর নির্দেশসম্মত।

কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হয়েও চীনের সেই প্রাচীনকালের Expansionism—বিস্তারবাদ তার প্রাণশক্তির বিশেষ ধর্ম। কম্যুনিজমের বিশ্ব-বিপ্লবাদর্শ তাকে আদর্শের বল বা ললাটে ধর্মতিলক এঁকে দিয়েছে।

Dr. Lea William একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, দূরপ্রাচ্যের ইতিহাস ও তার গবেষণাই তাঁর আলোচ্য বিষয়। তাঁর উক্তি তুলে দিচ্ছি—

"The final and fundamental objective of the Chinese Communists is to propagate Marxism abroad and whenever an opportunity presents itself, bring about the establishment of a Communist regime in other countries. During the early years of the regime Communist policy in Asia was one of revolutionary and armed struggle. Peking gave support to the Communist guerrillas in Malaya (most of whom were Chinese) assisted the Communist forces in Vietnam, took part in the occupation of North Korea and the attempt to seize South Korea and gave help to

Communist dissidents in Burma, the Phillipins and elsewhere."

এই elsewhere-এর মধ্যে ১৯৫০-৫১ সালে ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টি যখন নিষিদ্ধ হয়েছিল তখন এখানেও সাহায্য প্রেরণের পরিকল্পনা এবং এসিয়ায় তথা দুনিয়ায় সমগ্র কম্যুনিস্ট-জগতে একটি চীনা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার কোন খসড়া যদি ভবিষ্যতে পিকিংয়ের পরিত্যক্ত বা ব্যর্থ পরিকল্পনার কোন ফাইলের মধ্যে পান তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর তটবর্তী পৃথিবী থেকে অপর সকল প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজ ও জীবননৈতিক আদর্শ উচ্ছেদ করে তার লক্ষ্য শুধু সুদূর আমেরিকার দিকেই নিবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমদিকে কম্যুনিস্ট দেশগুলির উপর প্রধানের একাধিপত্যও ছিল তার প্রসুপ্ত কামনা। মস্কোর সঙ্গে পিকিংয়ের ভেদ—ক্রুশ্চেভের সঙ্গে মাও সে-তুঙের মতান্তর ও মনান্তরের উৎপত্তি সেই প্রাচীন চীনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলাই বোধ হয় ভাল। স্তালিনের সময় অসংগঠিত চীন, রাশিয়ার সাহায্যকামী চীন যা বলতে পারেনি, স্তালিনের অন্তে সে তাই বলেছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই সে বলেছে। একটু বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়বে। প্রথম কথা, চীন-রাজ্যের সুদীর্ঘকালে সমরতান্ত্রিক মনোভাব। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে নিরন্তর গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং তার সঙ্গে সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছরে বিভিন্ন রাজবংশের অধিনায়কত্বে বারবার দেশান্তর বিজয়ের ঐতিহ্য তার কম্যুনিজমকেও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশান্তরে প্রসারকামী রূপ দিয়েছে। মাও সে-তুঙের ঘোষণা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

দ্বিতীয় কথা, কম্যুনিস্ট-জগতে চীনের এবং মাও সে-তুঙ তার সঙ্গে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির মর্যাদার কথা। ১৯৪৯ সালে চীন কম্যুনিস্ট-জগতে যে আসনটি লাভ করলে সেটি পূর্ব-ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলির নেতৃবৃন্দ পরিবৃত কম্যুনিস্ট-চক্রের মধ্যে কেন্দ্রের সিংহাসন থেকে

কিছুটা দূরে। সে তখন নবীন আগন্তুক, সকলেই তাকে কনিষ্ঠের সমাদরে সমাদৃত করেছে। বিশাল ভূখণ্ড চীন, জনসংখ্যায় সে পৃথিবীর বিপুলতম জনসংখ্যার অধিকারী। কিন্তু বৈষয়িক সম্পদে এবং ব্যবহারযোগ্য উপকরণের অভাবে পীড়িত। সে-সব উপকরণ পাবার বিনিময়ে কনিষ্ঠের সমাদর এবং আসন তার সহ্য হয়েছিল। ক্রমে তাদের সাহায্যেই সে যখন সুসংগঠিত এবং দৃঢ়-সংবদ্ধ সামরিক শক্তির অধিকারী হল, তিব্বত, কোরিয়া, ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করে পূর্ণ-বিজয় না করতে পারলেও অর্ধ-বিজয়ের অধিকারী হল, তখন সে ক্রমে ক্রমে রাশিয়ার বিধাতা কম্যুনিস্ট-জগতের সর্বাধিনায়কের দক্ষিণের আসনখানি অধিকার করে বসল। রাশিয়া থেকে শুরু করে সমস্ত কম্যুনিস্ট-জগতেরও তখন অনেক প্রত্যাশা চীনের কাছ থেকে। পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে চীনের ৬৫-৭০ কোটি জনবল এবং চীনের সু-কৌশল প্রসার-অভিযানে কম্যুনিজমের বিস্তার পৃথিবীর মানচিত্রে লাল রঙের ও লাল ঝাণ্ডার আধিপত্য, যার পরিণাম সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এসিয়া জয়—ইত্যাদি অনেক কিছু। চীন নিরলস পরিশ্রমে নিজের সমরশক্তি সংগঠন করে চলেছে, একদিনও সে থামেনি। নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি এখানে। ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে চীন গিয়েছিলাম। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত চীনের সামরিক কৃতিত্বের কথা সে তখন প্রমাণ করেছে। ১লা অক্টোবর বিপ্লব দিবসে রেড-স্কোয়ারে তার সামরিক কুচকাওয়াজ দেখেছি। বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু ১৯৪৯ সাল থেকে '৫৭ সালের মধ্যে— ; আসল কথাটি বলবার আগে পটভূমিকার তথ্যটি বলে নিতে হবে ; সেটি এই।—বিশাল ভূখণ্ড চীনের মধ্যে ইয়াংসিকিয়াং সুদীর্ঘতম এবং বিপুল-বিস্তার নদী। এই নদী বিরাট চীনের একটি বিশাল অংশকে দু-ভাগে ভাগ করে রেখেছে। সভ্যতা ও সমৃদ্ধির প্রথম কয়েকটি পর্যায়ের মধ্যে পরিবহন এবং সুগম-সংযোগ অন্যতম। কিন্তু ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ইয়াংসিকিয়াংয়ের উপর কোন সেতু চীন

নির্মাণ করেনি। ১৯৫৭ সালের ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রথম সেতু নির্মিত এবং উন্মুক্ত হয়। দেশের যখন এমনই অবস্থা, চীন তখন সামরিক-সংগঠনে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং চীনের জীবন-গতি কোন দিঙ্‌মুখী তাতে সংশয় থাকে না। কিন্তু সে সংগঠনের লক্ষ্য শুধু অকম্যুনিস্ট ভূখণ্ডের দিকে ধরে নিলে একচক্ষু হরিণের মত ভ্রম করা হবে। চীনের প্রসার লক্ষ দক্ষিণে-বামে দুই দিকে সমান তীক্ষ্ণতায় প্রসারিত ছিল। স্তালিনের মৃত্যুর পরই স্বাভাবিকভাবে তার, অন্তত মাও সে-তুঙের প্রবীণতা এবং কৃতিত্বের দাবীতে কম্যুনিস্ট জগতের শূন্য কেন্দ্রীয় আসনখানি তার প্রাপ্য হয়েছে।

একটু কল্পনা করলেই আরও সুস্পষ্ট হবে। স্তালিন জীবিত থাকাকালে কম্যুনিস্ট জগতের সমারোহে মাও সে-তুঙ যখন স্তালিনের ডানদিকের মহান ব্যক্তি ছিলেন, তখন ক্রুশ্চেভ থাকতেন অনেক পশ্চাতে, হয়তো পাশে সারিবদ্ধ কর্মীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নতিও জানিয়েছেন। আজ তিনি রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক হয়েছেন বলে মাও সে-তুঙ তাকে তাঁর নেতা বা সম্মানিত জন বলে মেনে নেবেন কেন? অন্যদিকে ৭০ কোটি জনতা যখন সমরসম্ভারে সজ্জিত হয়েছে, তখন সেই জনতাই বা রুশের স্বল্পসংখ্যক জনতাকে অগ্রণী অগ্রবর্তী বলে মানবে কেন? সুতরাং তার কম্যুনিজমের ব্যাখ্যা রুশের ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র না হলে প্রাধান্য-বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে কোন্‌ পথে? আমি সেদিন চীন রাশিয়ার ভাবী বিরোধের কথা অনুমান করতে পেরে-ছিলাম। দেশে এসে চীন-ভ্রমণ সম্পর্কে কোন বই আমি লিখিনি। কারণ অধিকাংশ লেখক যাঁরা সেদিন বই লিখেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মতান্তর ঘটত। এবং এখানকার কম্যুনিস্ট জগতের গালাগালি এবং উচ্চনাদ অভিশম্পাতে অভিশপ্ত হতাম। আমাদের দেশের রাষ্ট্র-নায়কদেরও কয়েকজন বলেছিলেন, এমন রচনা এখন উচিত হবে না, কারণ চীন আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। আমি আজ স্বীকার করব যে, সেদিন আমি লেখক হিসাবে কর্তব্য করতে সক্ষম হইনি।

ছয়

চীনে কম্যুনিজম যে স্বতন্ত্র এবং বিশেষ চেহারাটি নিয়েছে তার কারণ, পূর্ব ইয়োরোপ থেকে চীনের সমাজব্যবস্থার পার্থক্য, তার ইতিহাসের ধারার ও সংস্কৃতির ধারার পার্থক্য এবং রূপায়ণের কালের পার্থক্য—এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। তার সঙ্গে আমি চীনের জীবনধাতুর কথাও উল্লেখ করব। বৌদ্ধধর্ম চীনে গিয়ে আমাদের দেশের বৌদ্ধধর্ম থেকে একটি পৃথক রূপ নিয়েছিল। যার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছি যে, আধার এবং আধেয়ের গুণবৈষম্য হেতু আধারে কলঙ্ক ওঠে, আধেয় যেটি সেটিও বিকৃত হয়। অন্তত গুণটির আসলত্ব আর থাকে না। পূর্ব ইয়োরোপ এবং পশ্চিম এসিয়ার কম্যুনিজমের সঙ্গে চীনের কম্যুনিজমের প্রকাশের ভঙ্গী ও রূপের মধ্যে প্রভেদ স্বাভাবিক। আরও একটা বড় কারণ আছে। সেটা হল এই, দুই দেশে রূপায়ণের কালের প্রভেদ। রাশিয়ায় যখন কম্যুনিজম রাষ্ট্রে ও সমাজে রূপায়িত ও ফলিত হয় তখন সারা দুনিয়া তার বিরুদ্ধে। এবং এই পরীক্ষাটিও সম্পূর্ণভাবে নতুন এবং প্রথম। রাশিয়াকে লৌহযবনিকায় সমস্ত কিছুকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে হয়েছিল। চীনে কম্যুনিজম রূপায়ণের কালে তার পৃষ্ঠ এবং পার্শ্ব রক্ষা করেছে রাশিয়া। ভারতবর্ষের প্রীতি এবং সমর্থনও এক পার্শ্ব নিরাপদ করে রেখেছিল। এর মধ্যে অকুতোভয়ে সে তার জীবনধাতুর নির্দেশ, তার ইতিহাস ও সংস্কৃতির ইঙ্গিত অনুযায়ী রূপ দিতে চেয়েছে এবং পেরেছে। তার জীবনধাতুতে আছে সমরপ্রিয়তা, ইতিহাসের সাম্রাজ্যবিস্তারী ধারায় আছে তার সমর্থন। সুতরাং সে সর্বাগ্রে তার সকল শক্তি প্রয়োগ করেছে সামরিক শক্তি সংগঠন ও বৃদ্ধিতে। বহু সহস্র বৎসর বহু সম্রাটের অধীনে চীনের জনসাধারণ যে প্রকৃতি অর্জন করেছে তাতে একদিকে চীন নায়কের অধীনে তারা পরদেশে নিষ্ঠুর নির্ভীক সৈন্যের কর্ম

করেছে; অন্যদিকে স্বদেশে স্বদলে মৃত্যুদণ্ড-ভীত একান্ত অনুগত মূক নির্বাক জনতা। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, মধ্যে মধ্যে তার প্রমাণ মিলেছে। মানবাত্মার পরমশুদ্ধ নির্ভয় প্রকাশই মানবদেহে জীবনশক্তির অমৃত তপস্যার (সভ্যতা ছোট কথা তা বলব না) স্বধর্ম এবং একমাত্র ধর্ম। সে সর্বত্র মানুষের মধ্যে আছে। সে অবিনাশী। মরুভূমির অভ্যন্তরে বালুস্তূপের গভীর প্রাণকণার মত ও মাঝে মাঝে ওয়েসিসের মত সে বিদ্যমান। লোকধর্মের মধ্য থেকে আকস্মিক লোকোত্তর ধর্মসাধকের আবির্ভাব ইতিহাসে চিরন্তন সত্য। সম্ভবত একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই আমার ধারণা। যদি হয় তবুও অনুতাপ প্রকাশ করব না আমি; সে দৃষ্টান্তটি রাশিয়ায় চল্লিশ বৎসর কম্যুনিস্ট ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে ওঠার পরও এবং সাহিত্যক্ষেত্রে দস্তয়েভস্কির মত এমন মহৎ এবং শক্তিশালী লেখকের রচনাবলী নির্বাসিত হওয়ার পরও শ্রীপাস্তারনাকের ডাঃ জিভাগোর তুল্য এই মহৎ তৃষ্ণায় বেদনাকাতর রচনার আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে।

যাক। চীনে, চীন কম্যুনিস্ট পার্টি সীমান্তের দিক থেকে তিন দিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে কম্যুনিজমকে যে রূপে রূপায়িত করতে চেষ্টা করছেন এবং করেছেন—তার সম্পর্কে ভারতবর্ষের এবং বিভিন্ন অকম্যুনিস্ট দেশের বহু লেখক চীনকে সুখের স্বর্গ এবং সব পেয়েছির আদর্শ দেশ বলে চিত্রিত করতে চেষ্টা করে বহু বক্তৃতা করেছেন, সভায় সমিতিতে বহুবিধ প্রচারও হয়েছে। তৎসত্ত্বেও বারবার দুর্ভিক্ষে চীনের দুরবস্থা চীনের সমাজজীবনে বহু অভাব অভিযোগের পীড়ন অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমার নিজের কথা পূর্বে বলেছি। পুরানো চীনের ডায়েরীখানি খুলে তার পাতা ওল্টাচ্ছি। মনে পড়ছে কলকাতায় P. E. N. Club-এর দ্বারা আহূত সভায় যা বলেছিলাম। তার কথাও মনে পড়ছে। আমি চীন দেখে যা ধারণা করেছিলাম তাতে খুব ভুল করিনি। চীন যুদ্ধোদ্যমের মধ্যেই

তার সংগঠন শুরু করেছিল। তার সংগঠন-উদ্যমের পশ্চাতে যে প্রেরণা সে প্রেরণা যুদ্ধের। তিনটি নেতিবাচক উদ্দেশ্য—(১) Anti Americanism, (২) Anti Chiang Kaishekism এবং (৩) Anti war-war (মাও সে-তুঙের—war to end war নীতি বা বাণী স্মরণীয়) ছিল চীনের সকল উদ্যমের উৎস। স্কুলে Young Pioneer বা শিশু বালকেরা ভোরবেলা উঠে এই ধ্বনি দিতে দিতে গিয়েছে। ইস্কুলে কিছুক্ষণ পড়েছে আবার এই ধ্বনি দিয়ে কুচকাওয়াজ করেছে এবং সন্ধ্যার পর মার্চ করিয়ে শহরে ঢুকে যেমন যেমন যার বাড়ি আসছে তাদের ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এদের ভঙ্গিতে এদের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ এবং উত্তেজনা আগুনের মত উত্তাপ বিকীর্ণ করেছে। যেন জ্বলে উঠবার জন্য ইন্ধন দাবী করছে। এই কথা আমার আজকের কথা (অর্থাৎ চীন ভারতবর্ষ সীমান্ত আক্রমণ করার পরের চিন্তার কথা) নয়। ১৯৫৭ সালের চীন ভ্রমণের সময় যে ছোট ডায়েরীখানি রেখেছিলাম আজ তারই পাতা উল্টে ৯ই অক্টোবর চুংকিং শহরের ডায়েরী দেখে লিখছি। চোখের সামনে ইয়ং পায়োনীয়ারদের মার্চ ভেসে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। কানে তাদের শ্লোগানের উত্তেজনার রনরন করা কণ্ঠস্বর বেজে উঠছে। সেই তিন মুর্দাবাদ ধ্বনি! ডায়েরীর কয়েক ছত্র তুলে দিই।

"চুংকি শহর এরোড্রোম থেকে প্রায় কুড়ি মাইল। পাহাড়ের উপর শহর। বড় সুন্দর। একেবারে আসামের মত ভূমিপ্রকৃতি। চুং-কিং শিলং-এর মত এত সুন্দর, এত উঁচু নয়। অনেকটা ওই রকম। তবে ইয়াংসি নদী একে অন্য সৌন্দর্য দিয়েছে। এখানে নানান গড়নের কাজ চলছে। শহর থেকে শুরু। (অর্থাৎ গ্রামে কাজ শহরের পরে।) এদের কাজই শহর থেকে শুরু। শহরের বাইরে কুড়ি মাইল পথের দু ধারে অনেক দৈন্যের চিহ্ন। ভাঙা ঘর, অন্ধকার ঘর, ঘুপচি ঘর, অপরিচ্ছন্ন পারিবাশ্বিক। সামনে বসে আছে, কাজ করছে দরিদ্র জন। সামান্য একটা তালি-দেওয়া জামা (শীত

এখানে বেশ), একটা তেমনি পাতলুন, পায়ে একটা খড়ের চটি। শহরে ঢুকেই ঐশ্বর্য। হোটেলটি একেবারে রাজকীয়…। কাল বিকেলে (১০ই অক্টোবরের ডায়েরী) খেলার স্টেডিয়ামে গিয়ে অবাক হয়েছি। (প্যারেড চলছিল, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছিল।) পিকিং-এর প্যারেড (১লা অক্টোবরের) সাজানো-গোছানো নিশ্চয়ই কিন্তু কৃত্রিম নয়। (এখানকার সব কিছুর মধ্যে সাজানো কিছু নেই এবং অকৃত্রিম তো বটেই।) এখানে পঁচিশের নিচের বয়সী ছেলেরা এই খেলার রঙ্গমঞ্চে ভাবী জাতি তৈরি করছে। দেখে আমার মহাভারতের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়ল। (অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের কথা।) প্যারাসুট জাম্পিং-এর ট্রেনিং হচ্ছে খেলার মধ্যে।”

মনে পড়ছে চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে থেকে শুরু করে তরুণেরা ১০০ ফুট আন্দাজ উঁচু পোল থেকে প্যারাসুট বেঁধে ঝাঁপ খেয়ে নীচে বিছানো বালির রাশির উপর এসে পড়ছে।

“চুংকিং-এ সকাল-বিকাল নেই, বাদল নেই, (বাদ্‌লা ছিল সেদিন) বালক (৮।১০ বছর), কিশোরী-কিশোর, যুবক-যুবতীদের মার্চ চলছে। গলায় লাল রুমাল বাঁধা (স্কাউটদের মত) সারিবন্দী চলছেই। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে একটা আশ্চর্য জাতি তৈরী হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি জাতি ?”

আর একদিনের কয়েকটি কথা—১৬ই অক্টোবরের, তখন আমি হ্যাঙ্কাউ শহরে। ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপর প্রথম ব্রিজ তৈরী হয়েছে ১৫ই অক্টোবর, আগেই বলেছি। তার পরদিন—

“…একটি লেক দেখতে গেলাম। বিরাট লেক। লেকের একটা দিকে বিরাট পার্ক, কচি উইলো গাছের সারির মধ্য দিয়ে আঁকা-বাঁকা রাস্তা। মধ্যে মধ্যে সুন্দর বাড়ি। কোনটি মিউজিয়ম, কোনটা বিশ্রামস্থান, কোনটা কিছু। তিনটি স্ট্যাচু দেখলাম। একটি এক বালিকার। বোধ হয় শিশুদের প্রতীক। একটি লোহার

বল ছুঁড়তে উদ্যত এক বিশাল বলশালী যুবার এবং আর একটি এদের সাহিত্যিক-প্রধান লু-সুনের…। এদের সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং সুন্দর। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, যাদের এমন সৌন্দর্যবোধ তারা শ্রেষ্ঠ সুন্দরকে মানে না কেন? মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য যারা প্রাণপণ করেছে, তারা শ্রেষ্ঠতম কল্যাণের প্রতীককে অস্বীকার করে কেন? বোধ করি হিংসাকে এখনও বর্জন করতে পারেনি বলে। হিংসাকে হয়তো সত্য করে বর্জন দুজন-চারজন ছাড়া অন্যেরা পারে না, কিন্তু তারা অহিংসাকে মানে। ওইখানেই প্রেমের স্পর্শ এসে পৌঁছয়।"

চীনের যুব-সমাজেরই শুধু নয়, অধিকাংশেরই হিংসাউত্তপ্ত বিক্ষোভ এবং বিদ্বেষ আমাকে পীড়িত করেছিল। এঁদের এই উগ্রতার সঙ্গে মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল তাসকেন্দে। তখনও এঁদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ যবনিকার অন্তরালে। অন্তত ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এর বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। সেদিন এঁদের সঙ্গে মতবিরোধ হতেই (এঁদের যুদ্ধ-প্রবণতামূলক মনোভাব ও উক্তিকে সমর্থন করতে অস্বীকৃত হওয়ায়) এঁরা মুহূর্তে ক্রুদ্ধ মূর্তিতে ফণা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তা দেখে এই কথাটি আমার নতুন করে মনে পড়ছিল। এবং বিস্মিত হইনি আমি। (এই প্রসঙ্গে কিছু কথা আমার বলবার ছিল; দেশের প্রয়োজনেই ছিল। কিন্তু তার মধ্যে "আমি" বারবার এসে পড়বে বলেই তা বলিনি। সেই সময়ে, ১৯৫৮ সালে, আনন্দবাজারে ও যুগান্তরে প্রকাশিত মস্কোর চিঠির ভুল তথ্যের প্রতিবাদে মাত্র কিছু বলেছিলাম।) চীনা প্রতিনিধিরা আমেরিকা ও চিয়াং কাইশেকের নাম উল্লেখ করে মাও সে-তুঙের war to end war-এর উপর ভিত্তি করে যে ক্রুদ্ধ আস্ফালন করেছিলেন তা থেকেই চীনের অচিরভবিষ্যতে যুদ্ধোন্মাদ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আমার কাছে খুব অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু সে উন্মত্ততা যে কুয়েময়ে আমেরিকার হিন্তালদন্তের কাছে প্রতিহত

হয়ে দক্ষিণ দিকে ভারতের সীমান্তে ছোবল মারবে, সে কথা ভাবতে পারিনি।

থাক, পরের কথা পরে বলাই সঙ্গত। এখন আমার ডায়েরী থেকে আরও কিছু অংশ তুলে দেব। ১৮।১০।৫৮ তারিখের ডায়েরী। সেদিন আমি সাংহাইয়ে।

"সকালে প্রাতঃকৃত্য স্নান সেরে 'মাকে' ডেকে জানালার ধারে দাঁড়ালাম। কালকের মেঘ কেটে গেছে। বাতাস নেই। গাছ দুলছে না। কাচে-ঢাকা জানালার পিছন থেকে এ ছাড়া অন্য কোনভাবে বাতাস নেই—এ বুঝবার উপায় ছিল না। প্রসন্ন প্রভাত। সূর্যদেবতার আশীর্বাদে আকাশ-মাটি জ্যোতি ও মহিমায় দীপ্ত এবং উষ্ণ হয়ে উঠেছে···। সামনেই বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ। যা এই নবীন চীনের বিশেষত্ব···। কাল রাত্রি ৯টার সময় দেখেছি উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থায় ভলিবল খেলা হচ্ছিল। (এখানে একটি কথা মনে করিয়ে দিই যে, সাংহাইয়ের রাত্রি ৯টা আমাদের রাত্রি প্রায় ১২টার সমান বোধ হয়।) এখন সকালে দেখছি চার দলের ফুটবল খেলা চলছে। এক পাশে হাইজাম্প প্র্যাক্‌টিস চলছে। কলকাতাতেও সকালে ছেলেরা ফুটবল খেলে। কিন্তু তার পিছনে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা ও নির্দেশ এবং জাতীয় মনোভাব নেই। সেখানে প্রতি পদক্ষেপে বিশৃঙ্খলা···। কাল এরোড্রোম থেকে আসবার সময় দেখেছি, পথে একটি যুবতী মেয়ে একদল ছোট ছেলেদের মার্চ করিয়ে নিয়ে চলেছে।"

সাংহাইয়ে হোটেলের সামনে যে পার্কের কথা বলেছি সেখানে শনি-রবি ছুটো দিন বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের সকাল থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত দেখেছি। শুধু কুচকাওয়াজ, স্পোর্টস, তার সঙ্গে স্লোগান। এবং মুষ্টি আস্ফালন।

অনেকে ভাবতে পারেন, এ সবই আমার বিরূপ মনোভাবদুষ্ট আয়নায় সত্যের বিকৃত প্রতিফলন। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবেই তা

অস্বীকার করি। এই ১৮ তারিখের ডায়েরী থেকে সাংহাইয়ের শ্রমিকপল্লী দেখে যা লিখেছি তা খানিকটা তুলে দিচ্ছি। তার আগে গিয়েছিলাম স্টেজ দেখতে।

"স্টেজটা এখন সম্পূর্ণ হয়নি। এখনও তালপাতার চ্যাটাই দিয়ে মোড়া রয়েছে। ভিতরে প্রায় হাজার পাঁচ লোকের বসবার স্থান···। বিরাট স্টেজ। Opening আমাদের স্টেজগুলির দ্বিগুণ। ভিতরে গ্রীন-রুমটি দোতলা এবং প্রকাণ্ড। অতি সুন্দর। এখান থেকে গেলাম শ্রমিক বসতি দেখতে···। শ্রমিক পল্লীটি চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চওড়া রাস্তার ছু ধারে বাড়ির সারি। এখানে তিরিশ হাজার শ্রমিক থাকে, তাদের মধ্যে ছ হাজার পরিবার। একটি পরিবারের বাড়িতে গেলাম। ছুখানি শোবার ঘর ও রান্না ঘর। আসবাবপত্রের মধ্যে ঘড়ি, রেডিয়ো রয়েছে। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য নার্সারী ইস্কুল, কিণ্ডার গার্টেন স্কুল, প্রাইমারি স্কুল দেখলাম। সবই সুন্দর দেখলাম। শ্রমিকদের সুখের জন্য এরা প্রচুর করেছে। আমাদের দেশে ছুখানা ঘর রান্নাঘর হয়তো বহু স্থানেই আছে, কিন্তু তারা এমনভাবে থাকে না···। এবং ছেলে-মেয়েদের জন্যে এমন ব্যবস্থা নেই। আমি জানি না, দেখিনি। শুনলাম, এখানে এমনি বারোটি শ্রমিক-শহর আছে। ভবিষ্যৎ কালের জন্য এদের চেষ্টার অন্ত নেই। প্রতিটি শিশুকে এরা কম্যুনিস্ট করে গড়ে তুলবে। পথে আবার সেই দৃশ্য। সেই একটি মেয়ে ছেলেদের মার্চ করিয়ে নিয়ে চলেছে।"

এই সাংহাইয়ের ডায়েরী থেকেই আর একটি স্থান তুলে দিচ্ছি। ১৯ তারিখের। গেলাম নব্য চীনের নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা বলে পূজিত লু-সুনের সমাধি দেখতে। লু-সুনের সাহিত্যের সত্যকারের কি মূল্য সে বিচার আমি করিনি। কারণ তাঁর রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আমার ছিল না। আমি নূতন চীনের বিশ্বাসে বিশ্বাস রেখেই তাঁরা তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাই স্বীকার করে

নিয়ে সেই আসনের সম্মুখে মাথা নত করেছিলাম সেদিন। আজও করি। কারণ লু-সুন এবং রাজনৈতিক নেতা যাঁরা প্রতি পদক্ষেপ করেন ভাবীকালের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের কুটিল চক্রান্ত সম্মুখে রেখে, এঁদের দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। হয়তো বা চীনে কম্যুনিস্ট রাজত্ব স্থাপিত হলে, সাহিত্যিক স্বাধীনতা ও নেতার নির্দেশের মধ্যে বিরোধ বাধলে, তিনি কি করতেন জানি না। কিন্তু তার অনেক আগেই তিনি বিগত হয়েছেন। সুতরাং এই সম্মানে সংশয় প্রকাশ করবার কারুরই অধিকার নেই। এবার ডায়েরী তুলে দিচ্ছি।

"মহান লু-সুনের সমাধি দেখতে গেলাম। ফুলের 'রীদের' (Wreath-এর) জন্য বলে রেখেছিলাম। মস্ত বড় ফুলের রীদ নিয়ে এল। তাতে সাদা কাপড়ের নাম লিখে নিয়ে গেলাম। শহরের উত্তর প্রান্তে (বোধ হয়) এখানকার রেওয়াজমত বিরাট পার্কের মধ্যে সমাধি। মস্ত বড় স্ট্যাচু। হাজারে হাজারে ছেলেমেয়েরা পার্কে এসেছে। আমি সত্যকারের শ্রদ্ধান্বিত অন্তর নিয়ে এসেছিলাম। এত বড় দেশের একজন সর্বজনস্বীকৃত সাহিত্যস্রষ্টা এবং বিপ্লবী কর্মী। জীবনে তাঁর ফাঁকি ছিল না। সমাধিস্থলে জুতো খুলে রীদ দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করলাম। (আমাদের প্রথা অনুযায়ী, যাতে ওদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ওরা নিজেরা জুতো খোলে না, এভাবে মাটিতে মাথা রেখে প্রণামও করে না।) ...এরপর আমাকে ভিতরে আপিসে নিয়ে গিয়ে একখানি দামী কাগজ দিয়ে বললে, 'কিছু লিখে দাও'। আমি দু লাইন কবিতা লিখে দিলাম।

'যে গান গেয়েছ তুমি মানুষের লাগি
চীনের প্রাচীরে সেতো আঁক বাঁক ময়—
লঙ্ঘিয়া পাহাড় নদী মানুষের মাঝে
ছড়ায়ে পড়েছে আজ সর্ববিশ্বময়।'

হোটেলে ফিরে মনে হল চীনের দিনগুলির মধ্যে আজকের সকালটি সত্যই মূল্যবান।

"দুপুর বেলা খেয়ে শোওয়া হল না। সামনের জানালা দিয়ে দেখছি সাদা জামা কালো প্যান্ট পরা ছেলে এবং মেয়ে দলে দলে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লাল পতাকা নিয়ে পার্কে এসে জমছে। বোধ করি হাজার পাঁচেক ছেলেমেয়ে। সামনে ডায়াস। সেখানে চেয়ারম্যানের (মাও সে তুঙ) ছবি। ব্যাণ্ড বাজছে। তারা মার্চ করছে। এমনই মার্চ হচ্ছে নানান পার্কে। এই আশ্চর্য শক্তি সংগঠন পৃথিবীর সব থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিকে যে ভবিষ্যতে এই শিক্ষার কল্যাণে বিশ্বজয়ী করে তুলবে তাতে আর সন্দেহ নেই। তখন, নবীন চীন নতুন করে পরম বুদ্ধকে স্মরণ করো।"

এর মধ্যেই আমার মনের রূপ স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করি।

তবু আরও একটু বেশী স্পষ্ট করবার জন্য আরও একটু তুলে দিচ্ছি। ১৫ই অক্টোবরের (১৯৫৭) ডায়েরী। সে দিন আমি হ্যাঙ্কাওয়ে। এই তারিখেই চীনে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপর প্রথম সেতুটি ব্যবহারের জন্য সমারোহের সঙ্গে উন্মুক্ত হল। সেই অনুষ্ঠান থেকে ফিরছি।

"একটার (বেলা) পর হোটেলে ফিরে এসে শুধু দুধ এবং ওটমিল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। মন বড় ক্লান্ত, দেহও ক্লান্ত। আর যেন পারছি না।...দুপুর বেলা প্রচণ্ড গরম গেল। এই হ্যাঙ্কাওয়ে এসে হোটেলে প্রথম ফ্যান পেলাম। ফ্যান খুলতে হল। কিন্তু তবু ঘুম এল না। মন চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছে নানান প্রশ্নে। তিরস্কার করছি নিজেকে। 'কেন এলে?' দেশ দেখার লোভে? এই কি দেশ দেখা বলে? বাধ্য করে দেখাচ্ছে, তুমি বাধ্য হয়ে দেখছ। যারা হইহই করছে তাদেরও আমি জানি। যতই বলুক তাদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা। আমি অবসর নিয়ে ঘরে বসে ভেবে দেখছি তারা অনবসর তাদের সঙ্গে ঘুরছে। দেখছে শুধু চোখ। দেখার সঙ্গে জানা-চেনার সম্প

নেই। ওরা প্রমত্ত। আমার মত্ত হবার শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই। মত্ততা থেকে দূরে থাকছি বলেই আমার এই কষ্ট। ভেবে দেখতে দেখতে মনে হল, হয়তো (স্বদেশের) বন্ধু-বান্ধবদের ও দেশের লোকেদের কাছে আমার বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমার অক্ষমতা নিয়েও আমি এসেছি। এ যুগে এ প্রতিষ্ঠা সস্তা। তবু এসেছি—এ আমার ক্ষুদ্রতা…। রাজসূয় যজ্ঞে আসবে কারা ? আসবে রাজারা, আসবে ধনীরা। আর আসবে রবাহূত বা ভিক্ষাকামীরা। (ঠিক ভিক্ষুক নয়।) আমার মত যারা বাণপ্রস্থের দিকে চোখ ফিরিয়ে আছে তারা আসবে না। আসা আমার উচিত হয়নি। লেখকের স্থান এ নয়। তার স্থান মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দচারী মানুষের মধ্যে।

"কোন কিছু করবার নেই, কথা বলারও সঙ্গী নেই, নিজের কথা লিখে আনন্দ পাচ্ছি, কিছুটা মুক্তি পাচ্ছি, লিখে যাচ্ছি। ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যেতেই খেয়ে শুয়ে পড়ব কিন্তু Vice-Premier-এর ডিনারে নেমন্তন্ন ; না গিয়ে উপায় নেই। যেতেই হবে। তারপর বলছে লোকাল অপেরা। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই।"

* * *

"মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে প্রবোধ (সান্যাল) এলে সে অন্তত এই নদী গিরিবন এগুলিকে দেখে এক ধরনের আনন্দ পেতে পারত। তার সে নেশা আছে। সে চোখ আছে। এবং লেখারও ঝোঁক আছে। এ-ক্ষেত্রে সে বাংলা সাহিত্যে একক। এর মধ্যেও সে পথ কিছুটা করে নিত। প্রবোধের নাম আমি এদের কাছে দিয়ে জানিয়ে যাব।"

* * *

"আর একটা পথ ছিল (চীন সম্পর্কে দেশে গিয়ে বই লেখার) সেটা চতুরতার সঙ্গে মক্ষিকাবৃত্তি। চাতুর্যের একটা নেশা আছে। নেশা চোরেরও আছে, গোয়েন্দারও আছে। তাদের পথে পথে কেমন করে

দিন কেটে যায় তারা জানতে পারে না। কিন্তু যে চোরও নয় গোয়েন্দাও নয়, পথে তাদের রাত্রি নামলে সে রাত্রি বুকে চেপে বসে। কাটতে চায় না। দেশটিতে যদি স্বচ্ছন্দ ও স্বেচ্ছা-গতিতে ঘুরে বেড়াতে পারতাম তবে বড় ভাল হত। এ কষ্ট হত না।”

কম্যুনিজম রূপায়ণের মধ্যে চীনের অবস্থা কি, এ নিয়ে তাদের সম্মান সমারোহে সম্মানিত মুগ্ধ লেখকদের অনেক রচনা আছে এবং সেই সব লেখার সাহায্যে স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির এ দেশের মানুষকে চীন ও কম্যুনিজমমুখী করে তোলার ইতিহাস সুবিদিত। অনেকে আমার বন্ধু। তাঁদের দু-একজন অকপটে তাঁদের ভ্রান্তি স্বীকার করে সেসব রচনার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। কিছু শক্তিশালী ব্যক্তি জটিল রাজনৈতিক বুদ্ধির খেলাও খেলেছেন। যাঁরা কম্যুনিস্ট তাঁদের সম্পর্কে বলবার আমার কিছুই নেই। তাঁরা স্বধর্ম পালন করেছেন। পিতার বক্ষঃপঞ্জরাস্থি দিয়ে মহাভারতের শকুনি অক্ষপাটিকা তৈরি করেছিলেন (গঙ্গাজলে বা চিতায় নিক্ষেপ করেননি) কপট দ্যূতক্রীড়ার জন্য। কম্যুনিস্টদের এ প্রচেষ্টা তাই। কিন্তু যাঁরা কম্যুনিস্ট নন, অন্তত মুখে স্বাধীন মানসের গৌরবে উদ্ধত তাঁরা আজ পনের বছর ধরে ভারত-চীন সংস্কৃতি, ভারত-চীন বান্ধব, শান্তি সম্মেলন প্রভৃতি সমিতির মধ্য দিয়ে আকাশবিদারী চীৎকার করে চীনের জয় ও চীনের প্রেম ঘোষণা করে এলেন। তাঁরা কী, এই কথার উত্তর আজও পাইনি। এই তো কয়েক বৎসর আগে চীন-ভারত সংস্কৃতি সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীনের তিব্বত আক্রমণের কথা উল্লেখ করে একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। সেটি স্বাভাবিকভাবেই কিছু অপ্রিয় ছিল। প্রধানমন্ত্রীর চীন সম্পর্কে মোহের বিষয় বহু আলোচিত। সে আলোচনা সর্বক্ষেত্রে মধুর এবং প্রিয় নয়। বর্তমান আক্রমণের মধ্যে চীনের হিংস্র স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সে আলোচনা আরও তীব্র এবং কঠোর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন চীনের স্বরূপ পূর্বে

সঠিক বুঝা যায়নি। চীন প্রতারণা করেছে। চীন মিথ্যাবাদী এবং হিংস্র মনের পরিচয় দিয়েছে। এই প্রধানমন্ত্রীর সেদিনের সেই বাণীর মধ্যে যা ছিল তাতে তাঁর মর্মবেদনাই ছিল বড়। চীনের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছিল না। তবুও সেই বাণী এই প্রতিষ্ঠানের কর্তারা গোপন করেছিলেন, পাছে চীনের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। পাছে এই চীন-প্রেম-বিতরণকারী এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৬১ সালে দিল্লিতে শান্তি সম্মেলনের একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়। ১৯৬১ সাল, তখন ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে ভারতবর্ষ চঞ্চল এবং সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সেদিন দিল্লিতে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিরই একদল (যাঁরা দল থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তখন পর্যন্ত। তবুও যাঁরা মার্ক্সিস্ট।) বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তবুও এই নিয়ে কোন আলোচনা শান্তি সম্মেলনে হতে পায়নি, চীন প্রতিনিধিরা সম্মেলন ত্যাগ করবেন এই ভয়ে। এ কি ভয়, না, অন্য কিছু? এর জবাব আজও কেউ দেয়নি। অথচ ভারতবর্ষের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এসবের সঙ্গে যুক্ত এবং লিপ্ত। তাঁরা আমার থেকে এঁদের আরও অনেক ভালভাবে জানেন। আমি এক মাসের মধ্যেই ক্লান্তির মধ্যে চীনের বন্ধুত্বের স্বরূপ, কম্যুনিজমের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁরা পারেন-নি—একথা আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারি না। এক দিনের ডায়েরী তুলছি! ১৭ই অক্টোবর ১৯৫৮। হ্যাঙ্কাও থেকে সাংহাই যাব সেদিন।

"১১-১৫ মিনিটে হোটেল থেকে 'মাকে' স্মরণ করে বেরিয়ে এরোড্রোমে এলাম। ইন্দোনেশিয়ানরা খুব ফটো তুলছে। (এক দল ইন্দোনেশিয়ান লেখকও ঘুরছিলেন, আমার সঙ্গে অনেক জায়গায় দেখা হয়েছে। হ্যাঙ্কাওতেও ছিলেন। আবার সাংহাইও চলছিলেন। ইন্দোনেশিয়ানদের বর্তমান চীন ও কম্যুনিজম-প্রীতি সেইদিনও স্পষ্ট ছিল।) ওরা খুব জমিয়ে গোপন শলার মত চীনা বন্ধুদের সঙ্গে

আলাপ করছে। ইন্দোনেশিয়ান শ্রীমতী আজ ঝাঁকড়ামুক্তকেশী। (একটি তরুণী ছিলেন) এবং স্ল্যাকস্‌ পরেছেন। দল বেঁধে লেখকেরা এসেছেন বিদায় দিতে, সম্মান জানাতে। আমরা গেলে এঁরা বাঁচবেন। বাপ রে কি কাণ্ড! কি দায়িত্বই এঁদের বহন করতে হচ্ছে! বিদেশী লেখক-অতিথিদের গুরুর মত খাতির সেবা করতে হচ্ছে। (অথচ এইসব লেখকদের লেখা সম্পর্কে কোন ধারণা তাঁদের নেই।) এবং আলাপের মধ্যে সেই মাপা হিসেব-করা এক কথা। আমরা বহুকালের বন্ধু। দুই দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্যেই পৃথিবীর শান্তি, মানুষের সুখ নির্ভর করছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ ও চীনের। (আজ স্পষ্ট মনে হচ্ছে তাঁদের বিনিময়ের ইঙ্গিতের মধ্যে এই কথাটাই ছিল যে, ভারতবর্ষ চীনের কম্যুনিজম গ্রহণ করুক। অন্তত লেখক যারা এসেছে তারা এটা নিয়ে যাও।) কেমন করে আমরা আরও ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হতে পারি!

"বলবে আর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাবে—বিশেষ করে কর্তা-ব্যক্তিদের মুখের দিকে। তার বা তাদের মুখভাবখানা দেখে নিচ্ছে।"

আর একটি ঘটনার কথা বলব। সেও ঘটেছিল এই হ্যাঙ্কাওয়ে। হ্যাঙ্কাওয়ে আমার সঙ্গে লেখক সংঘ সঙ্গী হিসেবে একজন অধ্যাপককে দিয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি থাকতেন আমার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা সবই হত ইণ্টারপ্রেটার মেয়েটির মাধ্যমে। চীনের সর্বত্রই তাই। কোন ব্যক্তি কোন দিন ইংরেজী বলেননি। (এক চৌ এন-লাই ১লা অক্টোবরের সন্ধ্যায় দু-তিনটি কথা বলেছিলেন Good evening. How do you do? From India? Bengal—Calcutta? এই মাত্র) তা ছাড়া কেউ না। এই প্রফেসরটি বড় ভাল মানুষ। এটি বুঝেছিলাম তাঁর মুখ দেখে, তাঁর হাসি দেখে, তাঁর আচরণ থেকে। একদিন তিনি আমি এবং ইণ্টারপ্রেটার মুন লেক দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ছোট একটি বাগান আছে, চমৎকার

বাগান। দুই সঙ্গীতজ্ঞ গুণী বন্ধুর বন্ধুত্বের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছে এই বাগান। সেই গল্প শুনছিলাম। প্রফেসর লিউ চীনা ভাষায় বলছিলেন, ইণ্টারপ্রেটার মিস ল্যু তার অনুবাদ করছিল ইংরেজীতে। এই মেয়েটির সঙ্গে আমি প্রথম দিনই পিতাপুত্রী সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম জীবনের কোমলতম স্থানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এই কম্যুনিস্ট মেয়েটির মধ্য থেকে সেই চিরকালের মানুষের স্নেহ-শ্রদ্ধার আস্বাদন পাব। বিদেশে যেখানে সম্পর্ক শুধু ভদ্রতার, যার মধ্যে বারো আনাই প্রায় অভিনয়, সেখানে এই পথে অন্তত বারো আনা অকপটতা না হোক আট আনা অকপট আন্তরিকতা পাব। যাই হোক এই মিস ল্যু প্রফেসরের বলা গল্পটির অনুবাদ করে শোনালে আমাকে। অপরূপ কাহিনী। সেইটি বলতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে আমার মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে। প্রাচীন কালে চীনে অভিজাত বংশের এক যুবক অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। সঙ্গীত-চর্চার জন্য নিজের বাদ্যযন্ত্র সে নিজেই তৈরি করত। কিন্তু সে সঙ্গীত এমনই সূক্ষ্ম উচ্চমার্গীয় ছিল যে সাধারণ সমাজে সমাদর সে পায়নি। এমন কি যাঁরা বড় সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁরাও এর মর্ম গ্রহণ করতে পারেননি বা করতে চাননি। তিনি অভিজাত বংশের সন্তান। চীনের সম্রাট তাঁকে বংশগৌরবের জন্য তাঁর অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনে অভাব কিছুর ছিল না; শাসনকর্তার পদ, বংশগৌরব, সম্মান, সম্পদ সবই ছিল। তবু তাঁর নিজের মনে আনন্দ ছিল না, ছিল না তাঁর সঙ্গীতের অনাদরের জন্য। সেই কারণে এই সঙ্গীতচর্চা তিনি করতেন একান্তে। কোন নির্জন স্থানে বসে চর্চা করতেন। এক সময় তিনি এই হ্যাঙ্কাও অঞ্চলে শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। হ্যাঙ্কাওয়ে এসে 'মুন লেকে'র এই নির্জন স্থানটি তাঁর ভাল লেগেছিল এবং তিনি নিত্য রাজকার্যের পর সন্ধ্যায় এখানে এসে একটি গাছতলায় বসে তাঁর বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতেন।

আলাপ করছে। ইন্দোনেশিয়ান শ্রীমতী আজ ঝাঁকড়ামুক্তকেশী। (একটি তরুণী ছিলেন) এবং স্ল্যাকস্ পরেছেন। দল বেঁধে লেখকেরা এসেছেন বিদায় দিতে, সম্মান জানাতে। আমরা গেলে এঁরা বাঁচবেন। বাপ রে কি কাণ্ড! কি দায়িত্বই এঁদের বহন করতে হচ্ছে! বিদেশী লেখক-অতিথিদের গুরুর মত খাতির সেবা করতে হচ্ছে। (অথচ এইসব লেখকদের লেখা সম্পর্কে কোন ধারণা তাঁদের নেই।) এবং আলাপের মধ্যে সেই মাপা হিসেব-করা এক কথা। আমরা বহুকালের বন্ধু। দুই দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্যেই পৃথিবীর শান্তি, মানুষের সুখ নির্ভর করছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ ও চীনের। (আজ স্পষ্ট মনে হচ্ছে তাঁদের বিনিময়ের ইঙ্গিতের মধ্যে এই কথাটাই ছিল যে, ভারতবর্ষ চীনের কম্যুনিজম গ্রহণ করুক। অন্তত লেখক যারা এসেছে তারা এটা নিয়ে যাও।) কেমন করে আমরা আরও ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হতে পারি!

"বলবে আর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাবে—বিশেষ করে কর্তা-ব্যক্তিদের মুখের দিকে। তার বা তাদের মুখভাবখানা দেখে নিচ্ছে।"

আর একটি ঘটনার কথা বলব। সেও ঘটেছিল এই হ্যাঙ্কাওয়ে। হ্যাঙ্কাওয়ে আমার সঙ্গে লেখক সংঘ সঙ্গী হিসেবে একজন অধ্যাপককে দিয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি থাকতেন আমার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা সবই হত ইণ্টারপ্রেটার মেয়েটির মাধ্যমে। চীনের সর্বত্রই তাই। কোন ব্যক্তি কোন দিন ইংরেজী বলেননি। (এক চৌ এন-লাই ১লা অক্টোবরের সন্ধ্যায় দু-তিনটি কথা বলেছিলেন Good evening. How do you do? From India? Bengal—Calcutta? এই মাত্র) তা ছাড়া কেউ না। এই প্রফেসরটি বড় ভাল মানুষ। এটি বুঝেছিলাম তাঁর মুখ দেখে, তাঁর হাসি দেখে, তাঁর আচরণ থেকে। একদিন তিনি আমি এবং ইণ্টারপ্রেটার মুন লেক দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ছোট একটি বাগান আছে, চমৎকার

বাগান। দুই সঙ্গীতজ্ঞ গুণী বন্ধুর বন্ধুত্বের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছে এই বাগান। সেই গল্প শুনছিলাম। প্রফেসর লিউ চীনা ভাষায় বলছিলেন, ইণ্টারপ্রেটার মিস ল্যু তার অনুবাদ করছিল ইংরেজীতে। এই মেয়েটির সঙ্গে আমি প্রথম দিনই পিতাপুত্রী সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম জীবনের কোমলতম স্থানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এই কম্যুনিস্ট মেয়েটির মধ্য থেকে সেই চিরকালের মানুষের স্নেহ-শ্রদ্ধার আস্বাদন পাব। বিদেশে যেখানে সম্পর্ক শুধু ভদ্রতার, যার মধ্যে বারো আনাই প্রায় অভিনয়, সেখানে এই পথে অন্তত বারো আনা অকপটতা না হোক আট আনা অকপট আন্তরিকতা পাব। যাই হোক এই মিস ল্যু প্রফেসরের বলা গল্পটির অনুবাদ করে শোনালে আমাকে। অপরূপ কাহিনী। সেইটি বলতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে আমার মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে। প্রাচীন কালে চীনে অভিজাত বংশের এক যুবক অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। সঙ্গীত-চর্চার জন্য নিজের বাদ্যযন্ত্র সে নিজেই তৈরি করত। কিন্তু সে সঙ্গীত এমনই সূক্ষ্ম উচ্চমার্গীয় ছিল যে সাধারণ সমাজে সমাদর সে পায়নি। এমন কি যাঁরা বড় সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁরাও এর মর্ম গ্রহণ করতে পারেননি বা করতে চাননি। তিনি অভিজাত বংশের সন্তান। চীনের সম্রাট তাঁকে বংশগৌরবের জন্য তাঁর অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনে অভাব কিছুর ছিল না; শাসনকর্তার পদ, বংশগৌরব, সম্মান, সম্পদ সবই ছিল। তবু তাঁর নিজের মনে আনন্দ ছিল না, ছিল না তাঁর সঙ্গীতের অনাদরের জন্য। সেই কারণে এই সঙ্গীতচর্চা তিনি করতেন একান্তে। কোন নির্জন স্থানে বসে চর্চা করতেন। এক সময় তিনি এই হ্যাঙ্কাও অঞ্চলে শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। হ্যাঙ্কাওয়ে এসে 'মুন লেকে'র এই নির্জন স্থানটি তাঁর ভাল লেগেছিল এবং তিনি নিত্য রাজকার্যের পর সন্ধ্যায় এখানে এসে একটি গাছতলায় বসে তাঁর বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতেন।

কয়েকদিন যেতেই তাঁর চোখে পড়ল একটি অতি সাধারণ দরিদ্র চাষী ঠিক এই সময়টিতে এখানে এসে একটু দূরে বসে থাকে। তাঁর বাজনা শোনে। সব থেকে বিস্ময় বোধ করলেন তিনি এই লক্ষ্য করে যে, তাঁর বাদ্যসঙ্গীতের যে স্থানগুলি সূক্ষ্ম, যে স্থানগুলি তাঁর নিজের বিচারে সুন্দর নতুন এবং মূল্যবান, সেই সব স্থানেই তার মুখে মুগ্ধ প্রশংসার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। এই দরিদ্র চাষী বুঝতে পারে তাঁর এই সঙ্গীত? তিনি একদিন তাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, তুমি নিত্য এসে আমার বাজনা শোন দেখতে পাই। তোমার ভাল লাগে?

সে হেসে বললে, অপূর্ব লাগে। এ যেন স্বর্গীয় সঙ্গীত!

—আশ্চর্য! অপূর্ব লাগে বলছ! তা বল তো একটু ব্যাখ্যা করে, বল তো এই অপূর্বতার কথা।

দরিদ্র নিরক্ষর অশিক্ষিত চাষী আশ্চর্য প্রাঞ্জলতার সঙ্গে তাঁর সেই সঙ্গীতের ব্যাখ্যা সহকারে অপূর্বতার কথা বলে গেল। প্রাদেশিক শাসনকর্তা সাগ্রহে তার হাত চেপে ধরে বললেন, আজ থেকে আমরা বন্ধু। তুমি নিত্য আসবে, এখানে বসে আমরা সঙ্গীত আলোচনা করব। সে বললে, বেশ। এরপর দীর্ঘ নিত্য নিয়মিত এই আসরে দুই গুণী বন্ধু বসে সঙ্গীতচর্চার মধ্যে মনোরম সন্ধ্যা অতিবাহিত করতেন। তারপর একদিন হঠাৎ সম্রাটের আদেশনামা এল। শাসন-কর্তাকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হল। অবিলম্বে সেখানে যেতে হবে তাঁকে। মর্মাহত হলেন উভয়ে, কিন্তু কি করবেন? উপায়ান্তরহীন হয়ে শাসনকর্তাকে যেতে হল। যাবার সময় বন্ধুকে বললেন, আমি যাচ্ছি, কিন্তু ঠিক এক বৎসর পর এই দিনটিতে নিশ্চয় আসব এখানে। তোমার সঙ্গে দেখা করব, যে সব নতুন গান তৈরি করব এই বৎসরের মধ্যে, সে সব শুনিয়ে যাব। তুমি এই গাছতলায় আমার জন্য অপেক্ষা করো। দরিদ্র বন্ধু কাঁদলেন। কেঁদেই কথা দিলেন, হ্যাঁ, তাই হবে। বৎসরান্তে নির্দিষ্ট দিনে শাসনকর্তা অভিজাত বংশের গুণীটি এলেন তাঁর কথামত, হাতে তাঁর সেই যন্ত্রটি। কিন্তু কই বন্ধু? কোথায় সে?

গাছতলায় একটি লোক রয়েছে বটে, সে একান্তভাবে অপরিচিত। সে ঢাকা-দেওয়া কিছু জিনিস নিয়ে বসে আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও সে যখন এল না তখন গুণী ওই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখ, তুমি এখানকার এই নামের চাষী, কিন্তু সে অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, তাকে কি চেন ? তাকে কি দেখেছ এখানে ?

উত্তরে সেই লোকটি প্রশ্ন করলে, আপনার নাম কি এই ?

বিস্মিত হয়ে অভিজাত গুণী বললেন, হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে ?

তখন সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি বললে, আপনার সেই বন্ধু চাষী সঙ্গীতজ্ঞই আমাকে পাঠিয়েছে। কালও সে বেঁচে ছিল। আপনার জন্য এই সব খাবার তৈরি করেছে আপনি আসবেন বলে। কিন্তু শেষরাত্রে অকস্মাৎ সে মারা গেছে। শেষ সময়ে আমাকে ডেকে বলে গেছে যে, এই খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেন আমি আপনার জন্য এই গাছতলায় অপেক্ষা করি। এবং আপনি যেন এই খাদ্যগুলি খান। আরও আপনার নতুন গানগুলি শোনান।

আর একটু আছে গল্পের, সেটুকু এই যে, যতকাল এই অভিজাত গুণী বেঁচে ছিলেন, তিনি প্রতি বৎসর এই দিনটিতে এই চন্দ্র সরোবরের (মুন লেক) তীরে সেই গাছতলায় এসে বাজনা বাজিয়ে যেতেন। সেই গাছতলায় তুলসীমঞ্চের মত একটি স্মৃতিমন্দির রয়েছে।

গল্পটি সকলেরই ভাল লাগবে, আমার খুব ভাল লেগেছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ সিগারেট বের করে ধরাতে গিয়ে দেখলাম দেশলাই ফুরিয়েছে। সিগারেটে আমার আসক্তি প্রবল। এ কয়েকদিন একসঙ্গে থেকে ইণ্টারপ্রেটার সেটি জেনেছিল। প্রফেসর লিউ ধূমপান করেন না। মিস লু্য হেসে বলেছিল, আমি আনছি দেশলাই। এখানেই আপনারা অপেক্ষা করুন। সে চলে গেল। এই পার্কের ফটকের মুখে কিছু দোকান আছে সেদিকে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন একটি গল্পের

প্রভাব বেশ একটু মোহগ্রস্ত করেছিল। খেয়াল ছিল না যে আমার সঙ্গী ইংরিজী জানেন না। আমি প্রফেসর লিউকে ইংরিজীতেই বলেছিলাম, এ নিয়ে আপনাদের দেশে কোন কবিতাগ্রন্থ বা নাটক বা গল্প কিছু লেখা হয়নি? কথাটা শেষ করিনি বোধ হয়, কারণ মধ্যপথেই মনে পড়েছিল ওঁকে কখনও ইংরিজী বলতে শুনিনি এবং আমার প্রতি কথাই ওঁকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করে দেয় ইন্টারপ্রেটার। কিন্তু প্রফেসর লিউ সুন্দর ইংরিজীতে আমার কথার জবাব দিয়েছিলেন। উত্তরে আমিও কথা বলেছিলাম। কথার মালায়—আমার কথার উত্তরে আপনি নতুন কথার ফুল ফোটায় শ্রোতার মুখে তা জুড়ে জুড়ে মালার গ্রন্থন হয়েই চলে—সেদিনও তাই চলেছিল। আমিই কথা বলেছিলাম বেশী। বলেছিলাম, প্রফেসর লিউ, সম্ভবত আমি আর চীন দেশে আসব না। তবে যদি আমার দেশ বা সরকার এদেশের কোন নিমন্ত্রণ রাখতে আসবার জন্য অনুরোধ করেন তবে হয়তো আসব। যদি আসি, তবে আপনার কাছে আমার কথা দেওয়া থাকল, আমি আপনাকে চিঠি লিখব, অপনি এই তারিখে হ্যাঙ্কাওয়ে আমার জন্য সেই বন্ধুর উদ্যানে অপেক্ষা করবেন; আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

গল্পটির আবেগ আমাকেই শুধু বিচলিত করেনি, বলতে গিয়ে প্রসেফরও আবেগ অবশ্যই অনুভব করেছিলেন এবং আমার দুই হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, আমি প্রার্থনা করব যেন আপনি আবার চীনে ফিরে আসেন। আমি জেনে নেব কোন খাবার আপনার প্রিয়।

বলতে বলতেই তিনি থেমে গেলেন। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, তাঁর দৃষ্টি আমার দৃষ্টি থেকে ছেড়ে যেন আমার পিছনে কিছুর দিকে নিবদ্ধ হল এবং তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমি স্বাভাবিকভাবেই পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, মিস ল্যু ফিরছে। মিস আসতেই তার হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে আমি সেই আবেগ-বশেই বললাম, জান মিস ল্যু, প্রফেসরের সঙ্গে আমার একটি অপূর্ব

চুক্তি হয়ে গেল। আমি তাঁকে বললাম, যদি আবার চীনে কখনও আসি তবে প্রফেসরের সঙ্গে আমার দেখা হবে এই বন্ধুর উত্থানে। তিনি বললেন, তাঁকে আমার প্রিয় খাদ্যের তালিকা দিয়ে যেতে হবে।

আমিও মধ্যপথে থেমে গিয়েছিলাম, সব কথা বলতে পারিনি। কারণ আমার সামনে ছুজনের মুখ আশ্চর্যরূপে রূপান্তরিত হচ্ছিল। প্রেসেফর যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন। চোখের সেই দৃষ্টি—সে দৃষ্টি ভয়ার্ত না ব্যাকুল, না কি, বলতে পারব না। মিস ল্যু-এর মুখ রক্তাভ, চোখের দৃষ্টি স্থির এবং তিরস্কারে ভরা। আমি মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, কত বড় অন্যায় করেছি আমি কথাগুলি মিস ল্যুকে বলে। সারাটা পথ প্রফেসর আর কথা বলেননি। এবং পরের দিন থেকে প্রফেসরকে আমার সঙ্গে আর দেওয়া হয়নি। হ্যাঙ্কাও থেকে চলে আসবার দিন পর্যন্ত তাঁকে আর চোখে দেখিনি।

এরপর আমি বাকী দিন কয়েকটার জন্য যথেষ্ট সাবধান হয়েছিলাম। এবং এর কিছুদিন আগেই চীনে মাও সে-তুঙের 'শতপুষ্প ফুটে উঠুক' নাটকটির যে অভিনয় ঘটে গেছে তার গুরুত্ব ভয়ঙ্করত্ব বুঝতে আমার আর কোন কষ্ট হয়নি। এ নাটকের কয়েকটি চরিত্র এবং কয়েকটি দৃশ্যের কথা ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী শ্রীপ্রণব গুহের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। চীনের বিখ্যাত মহিলা লেখিকা Ting Ling স্টালিন প্রাইজ পাওয়া লেখিকা এবং পুরানো কম্যুনিস্ট কর্মী। Chin Chao-Yang পিকিংয়ের Peoples Literature-এর deputy editor, এঁরা পর্যন্ত রাষ্ট্রের বা কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দের কঠিন নিয়ন্ত্রণে নিষ্ঠুর পীড়ন অনুভব করে এর প্রতিবাদ তুলেছিলেন। এঁদের নেতৃত্বে কিছু লেখক সংঘবদ্ধ হয়েছিল। Chin Chao লিখেছিলেন—

"Writers are not free in their creation under the present society; while writing, the writers are

apprehensive, ill at ease and always cautious, lest some-one grab them from behind."

ফলে Chin Chao Yang এবং আরও কিছু সংখ্যক লেখককে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মজদুরি বৃত্তি অবলম্বনের দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। Tin Ling-এর নাম দেওয়া হয়েছিল বিষাক্ত আগাছা— "Poisonous Weed"; Ting Ling দৃঢ়তার সঙ্গে কম্যুনিস্ট জগতের 'ভ্রান্তি' 'error' স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলেন, ফলে তাঁকেও দণ্ডিত করা হয়েছিল। লেখিকা থেকে তিনি পরিণত হয়েছিলেন সামান্য মজদুরনীতে।

Pa-Chin সাংহাইয়ের লেখক সংঘের সভাপতি। চীনের বিপ্লবী যুগের একজন শক্তিমান ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলি আমার বেশী ভাল লেগেছিল। তার কারণ তাঁর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের মিল আছে। ভূস্বামী ঘরের ছেলে, বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন প্রথম কৈশোরে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের সঙ্গে আমার ধাত্রী দেবতার শিবনাথের সাদৃশ্য আছে। আচারে, আচরণে, ভদ্রতায়, ব্যক্তিত্বে সত্যই ভাল মানুষ এবং মর্যাদাবান মানুষ। তিনিও এই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে তিরস্কৃত হয়েছিলেন।

কম্যুনিস্ট রাজ্যে লেখকের স্বাধীনতা নেই—সেখানে লেখকের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী, এমন কি বিষয়বস্তুও রাজনৈতিক নেতারা স্থির করে দেন। রাশিয়ায় শ্রীপাস্তারনাকের জীবনের শেষ কিছুদিনের পর তা বোধ হয় আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের এই বাংলা দেশে যা ঘটেছে কম্যুনিস্ট লেখকদের ক্ষেত্রে ও জীবনে তার খোঁজ আমরা কেউ রাখি নে। আমাদের দেশেও কম্যুনিস্ট লেখকদের ক্ষেত্রে এইরকম দৃষ্টান্তের অভাব ঘটবে না। কম্যুনিস্ট চীনে যে লেখকদের সঙ্গে লেখার কি অবস্থা তা অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু তবু যে চীন দেশে অকম্যুনিস্ট কম্যুনিস্ট সহযাত্রী সাহিত্যিক অধ্যাপক শিল্পীরা সেখানে কোন্ স্বর্গ

রাজ্য আবিষ্কার করেছিলেন তা শুধু তাঁরাই জানেন। এ ক্ষেত্রে আজ এত কাল পর যে অর্থ আজ আপনা থেকে পরিস্ফুট হয়ে পড়েছে তা হল, এদেশে চীনের সুকল্পিত এই অভিযান সম্পর্কে অনুকূল ক্ষেত্র রচনার জন্যই চীন এঁদের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। যাঁরা গেছেন তাঁরা কেউ বা জেনে শুনে, স্বল্প কিছু লোক না জেনে এই ষড়যন্ত্র-জালখানি কাঁধে বয়ে এনে এ দেশে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কম্যুনিজম বিস্তারের আবরণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চীনের ভারত অভিযানের কল্পনা অনেকদিনের। আজ তা ব্যর্থ হয়েছে বলে তা পরিত্যক্ত হয়নি। আবার তারা অভিযানে অগ্রসর হবে। এ সুনিশ্চিত।

সাত

গতবারের নিবন্ধের শেষে আমি লিখেছি যে, চীনের এই আক্রমণ সুপরিকল্পিত এবং অনেক আগে থেকেই এর জন্য শুধু সে নিজের দেশের মধ্যেই আয়োজন করেনি, আমাদের দেশের মধ্যেও সে তার আয়োজন করেছে। পৃথিবীতে কম্যুনিজম এমন একটি ইজম বা বাদ বা ধর্ম যার নির্দেশ হল ছলে-কৌশলে-বলে মিথ্যায়-ছলনায় যে কোন উপায়ে হোক নিজেকে কোন রকমে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। তাই চীন করেছিল। শুধু ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাহায্যে নয়, আমাদের দেশের একদল বিদগ্ধ আখ্যাধারী আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী এবং অর্থসম্মানলোলুপ বুদ্ধিজীবী লোকেরাও তাতে সাহায্য করেছেন। এ সব লোক ভারতবর্ষে চিহ্নিত হয়েই আছেন। রাজনীতিক সাহিত্যিক শিল্পী অভিনেতা গায়ক—কাদের মধ্যে এঁরা নেই। কিছু সংখ্যক লোক এর মধ্যে আছেন যাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন বা করেছিলেন যে, চীনের বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্র ভারতবর্ষের মানুষের সত্যকার বন্ধু এবং কম্যুনিজমেই মানুষের সত্যকারের কল্যাণ। বর্তমান সরকারকে প্রথম প্রথম অনেকে কখনও দুর্যোধন, কখনও দুঃশাসন

বলে উপমা দিতেন। এ কালে অবস্থার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে কিছুটা সংগঠন, কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য, কিছুটা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হলেও কথাগুলোকে বদল করেননি। পার্লামেণ্টে শ্রীকৃষ্ণ মেননকে পদত্যাগ করতে হয়েছে এই অপবাদে; অনেকে স্তব্ধ হয়েছেন; অনেকে পুরোপুরি উল্টো কথাও বলছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও ভেদ ঢুকেছে। ১০।৩।৬৩ তারিখে একজন বলে গেলেন, একজন তরুণ, তিনি সাহিত্যানুরাগী, লেখকও বটেন—মানসিক যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেছেন। তবে এই আক্রমণের পরিণতি ঠিক বর্তমানে যা ঘটেছে তা না ঘটলে তাঁরা যে কি করতেন, তা বলা কঠিন। দেশে জনসাধারণ সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র হাতিয়ার কাস্তে কোদাল খন্তা নিয়ে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে এক সঙ্গে চীন ও কম্যুনিজম জিন্দাবাদ বলে স্বাগত সম্ভাষণ করবেন। তাঁরাও যে আনন্দে নৃত্য করতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে তাঁদের মত পরিবর্তনের অনুতাপ প্রকাশের বা পাগল হবার কোন কারণই থাকত না এবং তাঁরা তা করতেনও না। তবে ভ্রান্তিও হতে পারে। নিশ্চয়ই হতে পারে।

সে যাই হোক; হয় তো ভ্রান্তিই বটে। কিছু লোকের তো বটেই। কিন্তু বাকী সব? এঁরা পণ্ডিত মানুষ, অবশ্য নাস্তিক্যবাদী পণ্ডিত—যাঁরা কম্যুনিস্টদের মতই মত ও পথের কোন সামঞ্জস্য বা সমতার প্রয়োজন আছে মনে করেন না। অসৎ অসাধু উপায়ে যে লক্ষ্যে পৌঁছুবার—সেটা সৎ হলেই হল বলে দোহাই পাড়েন। কিন্তু এর মধ্যে যে গান্ধীবাদী মানুষও রয়েছেন। প্রশ্নটা উদ্যত খড়্গের মত সামনে ঝলসে ওঠে সময়ে সময়ে। সে ঝলসানো আলোর ঝলকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের খৃষ্ট পূর্বাব্দ কাল থেকে গত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিদ্যুৎ রেখার মত ক্রূর বঙ্কিম এক আঁকা-বাঁকা রেখা চকিতভাবে জেগে উঠে যেন একটা বিচিত্র ইঙ্গিত দিয়ে যায়। বিচিত্র এই উপমহাদেশে দেশাভ্যন্তরে বহু রাজার উত্থান পতন হয়েছে, বহু বংশের অভ্যুত্থান বিলয় ঘটেছে, তাতে এই বিরাট মহাদেশের স্বাধীনতা

বিপন্ন হয়নি, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ যতবার হয়েছে, যে আক্রমণে রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজ বিধান সংস্কৃতির ধারা খণ্ডিত বিপর্যস্ত হয়েছে, ততবারের সেই শোচনীয় ঐতিহাসিক সংঘটন ঘটেছে—এমনই লজ্জাকর আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সময় পুরুর প্রতি বিদ্বেষবশে তক্ষশীলাধিপতি আম্ভী, মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে বৈদেশিক ইসলাম অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় পৃথ্বীরাজ-বিদ্বেষী জয়চাঁদ এবং পলাশীতে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় সিরাজ উচ্ছেদকামী এবং রাজ্যলোভী মীরজাফর রাজবল্লভ রায়দুর্লভ প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের ইতিহাসে বিশেষরূপে চিহ্নিত ঘটনা।

বর্তমানে চীনের গুণগানের মধ্য দিয়ে এবং কম্যুনিজমের পরমামৃতের কথা প্রচারের মধ্য দিয়ে যাঁরা এ দেশের সকল সংস্কৃতি, সকল সাধনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবার উন্মত্ততাকে তারস্বরে প্রচার করে এলেন, তা কি বিভীষণের ধর্মানুরাগের মত পবিত্র? রামায়ণে রাবণ রামপ্রিয়া সীতাকে হরণ করেছিল; পরনারী হরণ এবং ধর্ষণের মহাপাপ থেকে রাবণকে বিরত করতে চেয়েছিলেন বিভীষণ। বিনিময়ে রাবণ করেছিলেন পদাঘাত। তখন বিভীষণ অধর্ম পক্ষ ত্যাগ করে ধর্মপক্ষকে আশ্রয় করেছিলেন। রাজ্যলোভ তাঁর ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি লঙ্কার সিংহাসনে বসলেন রাবণ বধের পর সেই মুহূর্তে তিনি হয়ে গেলেন বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এঁরা?

এঁরা যাই হোন, ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্গুলী নির্দেশে বলে—বাহিরের শত্রু এবং বহিরাগত বিপদের অপেক্ষা ভিতরের এরাই শত্রু হিসাবে ভয়ঙ্কর এবং আভ্যন্তরীণ বিপদই কঠিনতর বিপদ। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় ও ঘৃণ্যতম গ্লানিকর অপরাধ বিশ্বাসঘাতকতা। এ কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে। জন্তু-জগতে চুরি আছে, লুণ্ঠন আছে, অবাধ হত্যাকাণ্ড আছে, হিংসা আছে, গুপ্ত

আক্রমণ আছে ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা নেই। বুদ্ধিবিকাশের চরম গৌরব এবং ন্যায়নীতি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের পরমতৃষ্ণার এটি বিপরীত দিক। বিদ্বেষ, স্বার্থবোধ, হিংসা ও লোভের তাড়নায় ও প্রশ্রয়ে বুদ্ধি পরিণত হয় বিশ্বাসঘাতকতায়। জন্তুর বিদ্বেষ আছে—স্বার্থবোধ-সর্বস্ব সে, হিংসাই তার ব্যষ্টি সম্পত্তি, লোভ তার মস্তিষ্ক এবং দৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হবার মত বুদ্ধি তার যথেষ্ট নয় এবং প্রখরও নয়। আবার বিশ্বাসঘাতকতা ভ্রান্তির পরিণামও বটে। পূর্বেই বলেছি সে কথা।

ভ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত দেব ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে। সম্ভবত এতেই পরিষ্কার হবে ভ্রান্তি কোনটা, বিশ্বাসঘাতকতা কোনটা। পূর্বেই বলেছি—বিভীষণ সীতা হরণের প্রতিবাদে পদাহত হয়ে রাবণের সঙ্গে রাক্ষস পক্ষ ত্যাগ করে এমন কি রামকে সাহায্য করেও বিশ্বাসঘাতকতার পাপে পাপী বলে চিহ্নিত হতেন না যদি তিনি রাবণের মৃত্যুর পর সাহায্যের প্রতিদানে লঙ্কার সিংহাসনে উপবেশন না করতেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভ্রান্তির ছলনা অজস্র। একটি সর্বজনজ্ঞাত দৃষ্টান্ত—চিতোরের মহারাণা সঙ্গের শেষ জীবন ও কানোয়ার যুদ্ধ। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ। উত্তরাপথে দিল্লী পাঞ্জাব রাজপুতানা অঞ্চলে তখন পাঠান শক্তি দুর্বল, বিলাসে ব্যভিচারে বিকৃত। ইতিহাসে রয়েছে, দিল্লীর সুলতান তখন নামে মাত্র সুলতান। এই সময়—

"Doulat Khan, the most powerful noble of the Punjab, who was discontented with Ibrahim Lodi because of the cruel treatment he had meted with his son, Dilwar Khan and Alam Khan an uncle of Ibrahim Lodi and pretender to the throne of Delhi, went to the length of invitting Babar to invade India."

বাবর এলেন সসৈন্য। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পানিপথের যুদ্ধে বাবর তাঁর স্বল্প সৈন্যের শৃঙ্খলার গুণে, নিজের বীর্য ও পরিচালনার গুণে ইব্রাহিম লোদীর প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যকে পরাভূত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন।

মহারাণা সঙ্গ তখন সমগ্র রাজপুতনার এবং কিছু আফগান শক্তির নেতা। দেশে এই বিদেশী বাবরের অভিযানে তিনি ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ দর্শকের মত সরে থাকলেন। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে তিনি ভ্রান্তিকে আশ্রয় করলেন। ভাবলেন, ইব্রাহিম বা বাবর যে-ই জয়ী হোক, সে এই যুদ্ধে দুর্বল হবে। তখন তিনি তাঁর বান্ধববর্গকে নিয়ে তাকে পরাভূত করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবেন। কিন্তু কানোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বাবরের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন—তখন বাবরের সৈন্যদল ভীতও হল। কিন্তু ১২০০০ সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদীর লক্ষাধিক সৈন্যকে পরাজিত করার স্মৃতি ও সাহস তাদের সাহায্য করলে। এবং সে যুদ্ধে রাণা সঙ্গ পরাজিত হলেন। কিছুদিন পরই জীবন দিয়ে এই ভ্রান্তির মুল্য তিনি পরিশোধ করলেন।

একেই বলি ভ্রান্তি। এখানে কুটিল স্বার্থের চক্রান্ত ছিল না। তাঁর কর্মপন্থায় অসৎ ও অসত্যের বা মিথ্যার কোন আবরণ ছিল না।

* * *

ভারতবর্ষ একটি দেশ নয়, সত্যই এ একটি উপমহাদেশ। ভারতবর্ষের জাতি ও জীবনধারা একটি নয়। তার সে ধারা শুধু ইতিহাসের দ্বারাই ধৃত নয়, পুরাণ ও ইতিহাস দুটির দ্বারা ধৃত এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় রজ্জুতে সে ঘেরা নয়, পুরাণের ধ্যানের স্বর্ণসূত্রের দ্বারা সে গ্রথিত হয়ে একত্রিত। ভৌগোলিক সংস্থানে উত্তরে হিমালয় হিন্দুকুশ ও উত্তর-পশ্চিমের সুলেমান প্রভৃতি পর্বতমালা এবং হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত থেকে দক্ষিণমুখী পর্বতমালা বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিমে দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত আমাদের এই

বিশাল ভূখণ্ড আশ্চর্যভাবে অবিচ্ছিন্ন একটি দেশ বা উপমহাদেশ। মধ্যস্থলে বিন্ধ্যপর্বতমালা সত্ত্বেও অবিচ্ছিন্ন অবিভাজ্য মানবজীবন ও সভ্যতার পক্ষে। এক্ষেত্রে হিমালয় তার এই অবিভাজ্যতা ও অবিচ্ছিন্নতার একটি অঙ্গ। প্রকৃতির এই নির্দেশেই হিমালয়ের জলধারাগুলির প্রায় সবগুলিই ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের মধ্যেই প্রবাহিত। গঙ্গা যমুনা এবং পঞ্চনদের পঞ্চনদনদী ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত, কিন্তু দুটি বিশাল নদ সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র যথাক্রমে পশ্চিম এবং পূর্বমুখী হয়ে উত্তর সীমান্ত রেখায় প্রবাহিত হয়েও অবশেষে দক্ষিণমুখী হয়ে ভারতের মৃত্তিকাতেই প্রবাহের মুখ ফিরিয়েছে। উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর শীর্ষে এই হিমালয়ের অবস্থিতিই ভারতবর্ষের মরু অঞ্চলের প্রভাব ও গতিকে রুদ্ধ করে রক্ষা করেছে। হিমালয়ের দিকে তাকালেই মনে হয় যে, এক মহাবিরাট তুঙ্গশীর্ষ পুরুষ যেন বাহুবেষ্টন করে শ্যামল কোমল মৃত্তিকাময়ী এক ভূমিপ্রকৃতিকে চির আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রেখেছে। এর মধ্যে যে প্রাণপ্রকৃতি স্থান পেয়েছে তার স্বভাব-ধর্ম এক এবং অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে এর মধ্যে যে প্রাণপ্রকৃতি তা একটি নয়। বহু বিচিত্র এবং ভিন্নের সমাবেশে গঠিত; কিন্তু পৃথক হয়েও এক এবং অভিন্ন। ভারতবর্ষের মানুষের বৈচিত্র্যের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ মিলবে। উত্তর শীর্ষে কাশ্মীরে শ্বেত গৌরকান্তি অমরনাথের দিকে দক্ষিণ প্রান্তের কৃষ্ণা কন্যাকুমারী মালা হাতে নিয়ে বরণোদ্যত। অমরনাথ এই মনোহারিণী কৃষ্ণার দিকে সতৃষ্ণ সানুরাগ দৃষ্টিতে তার আরতি করছেন। পশ্চিম প্রান্ত দ্বারকায় শ্যামল কিশোর-কৃষ্ণ উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বর্তমান লোহিত বিভাগের, পৌরাণিক মহাভারতের কালের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর বরমাল্য গ্রহণ করতে রথচক্রের চিহ্ন এঁকে পথরেখায় পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তকে গ্রন্থি দিয়ে গ্রন্থন করেছেন। বর্তমান দারং জেলায় প্রাচীন শোণিতপুরের অধিপতি মহারাজ বানের কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ দ্বিতীয় গ্রন্থি। মহাভারতের অন্যতম নায়ক তৃতীয়

পাণ্ডব মণিপুরে এসে চিত্রাঙ্গদার এবং নাগরাজের কন্যা উলুপীর পাণিগ্রহণ করে পশ্চিম পূর্বকে বা ভারত কেন্দ্রের সঙ্গে পূর্বকে বন্ধন করেছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে আবদ্ধ ব্রহ্মপুত্রকে প্রভুকুঠার নামক স্থানে মুক্ত করেছেন ভার্গব পরশুরাম। হিমাচল প্রদেশে দক্ষকন্যা সতীর দেহ-ত্যাগের পর রুদ্র বসলেন তপস্যায়। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে মদন হিমাচল কন্যা উমাকে সম্মুখে রেখে রুদ্রকে বিদ্ধ করলেন পুষ্পবাণে; ধ্যানভঙ্গে কুপিত রুদ্রের রোষানলে মদন ভস্মীভূত হলেন। উমার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে রুদ্র উমার বরমাল্য গ্রহণ করে ভস্মীভূত মদনকে অতনুরূপে সঞ্জীবিত করলেন কামরূপে। সতী অঙ্গ পড়ল পূর্ব প্রান্তে; দেবী কামাখ্যা নীল পর্বতে বিরাজিতা। প্রাগ জ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে সংহার করে ভগদত্তকে সিংহাসন দিলেন মহাভারতের মহানায়ক। রামায়ণের রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষণকে নিয়ে বনবাস পর্বে কোশল থেকে দণ্ডকারণ্যে এলেন। লঙ্কার দুর্মদ রাক্ষস রাবণ করলে সীতা হরণ; আকাশ-পথে নিয়ে যাবার সময় সীতার অশ্রুজল পড়ল কোন হ্রদের জলে, কোন নদীর জলে, অলঙ্কারগুলি পড়ল অরণ্যে পর্বতশিখরে প্রান্তরে; চিহ্নিত হল স্থানগুলি; রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে দক্ষিণে পদযাত্রায় সমস্ত দক্ষিণাপথ অতিক্রম করে রামেশ্বরমে গিয়ে শিবপূজা করে সেতুবন্ধনে সমুদ্র ব্যবধান অতিক্রম করে লঙ্কাদ্বীপে উঠে সীতাকে উদ্ধার করলেন। তার আগে মাল্যবান পর্বতে ঋক্ষরাজ এবং বানররাজের সঙ্গে মিতালী স্থাপন করেছেন। উত্তরাপথ থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত প্রসারিত এবং অকৃত্রিম হৃদয়ানুরাগের সঙ্গে গৃহীত হল সীতার নারীত্বের আদর্শ, রামচন্দ্রের পুরুষত্বের আদর্শ, তাঁর পিতৃভক্তি, তাঁর প্রতিজ্ঞাপালন, তাঁর পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, তাঁর মানবপ্রেম—সামগ্রিকভাবে মানবিকতার আদর্শ। ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি তাঁদের বীর ধর্ম পালনের আদর্শ। কোশল হতে রামেশ্বরম পর্যন্ত যে কত সহস্র মন্দিরে রামসীতা লক্ষ্মণ আজও বিরাজিত পূজিত, তার সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে সসম্ভ্রমে নিরস্ত হচ্ছি। কারণ সমগ্র

ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-মন্দিরে সীতারাম, ভরত লক্ষ্মণ বিরাজিত এবং সেখানে অহরহই রামায়ণ গীত হচ্ছে। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব বনবাসের সময় ঘুরেছেন সমগ্র ভারত। তার আগেও ঘুরেছেন বারনাবাতের দাহ্যগৃহ থেকে রক্ষা পেয়ে। অর্জুন ঘুরেছেন একক। এরই মধ্যে মহাভারতের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতবর্ষে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, ন্যায় ও নীতিপরায়ণতা, তাঁর প্রজ্ঞা ভারতবর্ষের সঙ্গে স্বর্গলোকের সেতু রচনা করে বাস্তব জীবনকে এক স্বপ্নস্বর্গ রচনায় সমাহিত করে এক বিরাট তপস্যারাজ্যে পরিণত করেছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। তার বাস্তববুদ্ধি ও বোধ কল্পনার আবেগের দ্বারা বার বার আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্ঠুর আঘাতে আহত হয়েছে। তবুও সে এই কল্পনার অনুভূতি ও উপলব্ধিকে কখনই মিথ্যা বলে মনে করতে পারেনি। এইখানেই সে একজাতি একপ্রাণ, এইখানেই তার ঐক্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচারের ভূমিকায় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন—

"We have consequently to approach the history of India in a different spirit, and adopt a different scale of values in order to appraise her culture and civilization. The war and conquests, the rise and fall of empires and nations, and the development of political ideas and institutions should not be regarded as the principal object of our study, and must be relegated to a position of secondary importance. On the other hand more stress should be laid upon philosophy, religion, art and letters the development of social and moral ideas, and the general progress of those humanitarian ideals and institutions which

form the distinctive feauture of the spiritual life of India and her greatest contribution to the civilization of the world." (The History of Culture of Indian People, Vol. 1, Page 43)

ভারতের চারিটি প্রান্ত এবং এই উপমহাদেশ তুল্য মহাদেশের মানুষের মুখের দিকে চোখ মেলে চাইলেই মনে প্রশ্ন জাগবে। অন্ধ যদি সে হয়, কান পাতলে প্রশ্ন জাগবে। আকৃতি, অবয়ব, বর্ণ, ভাষা, বেশভূষা, আহার রুচি, এর মধ্যে কোথায় ঐক্য—কিসের ঐক্য? এমন কি উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভারত দিগন্তের আবহমণ্ডল এবং ভূমিপ্রকৃতিতে এত পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যভেদ যে, সাধারণ অর্থে যে-সব কারণে একদেশ ও একজাতি নির্ণয় করা যায়—তা ভারতবর্ষে নেই। আছে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য। শুধু ঐক্যই নয়, অখণ্ডতাও বিদ্যমান। এ কথা পূর্বেই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান ও অবয়ব আকারের কথা বলতে গিয়ে সংক্ষেপে বলেছি। পৃথিবী প্রকৃতির যে সংগঠন, তার বা পৃথিবী প্রকৃতির যিনি সংগঠক, তাঁরই নির্দেশে গঠিত হয়েছে এ অখণ্ডতা। যার জন্য হিমাচলোদ্ভূত দুটি বিশাল জলধারা হিমাচলের বুক চিরে আদিতে একটি পশ্চিম ও একটি পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়েও ভারতের সীমান্ত নির্দেশ করে দক্ষিণমুখী হয়ে ভারতভূমির বুকের উপর তাদের সকল আশীর্বাদ ঢেলে দিয়ে সাগরসঙ্গমে পৌঁছেছে। সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র। এবং আবহমণ্ডলের এই বৈচিত্র্য এই ভেদ বা বিভিন্নতা ছয় ভাগে বিভক্ত হয়ে ষড়ঋতু পর্যায়ে সমগ্র ভারতেই বিদ্যমান; ঋতু পর্যায়ের তীব্রতা এবং বেগের তারতম্য অবশ্যই আছে, কিন্তু ষড়ঋতুর অস্তিত্ব সারা ভারতবর্ষেই স্বীকৃত। এ মানব-মানস-কল্পনার স্বীকৃতি মাত্র নয়—বাস্তবেও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

নৃতত্ত্বের দিক থেকে পণ্ডিতেরা বলেন—

No kind of man originated on the soil of India, all her human inhabitants having arrived originally

from other lands but developing within India some of their saliant characteristics and then passing on outside India.

এ কথার অর্থ দাঁড়ায় ভারতবর্ষ মানবসাধনার তপস্যা ক্ষেত্র। থাক এ কথা এখানে। নৃতত্ত্ববিদগণের অভিমত অনুযায়ী আটটি বিভিন্ন মানব জাতির শাখা বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছে। Dr. B. S. Guha বলেছেন—ছয়টি শাখা। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কয়েকটি ভাগ করেছেন।

(Dr. Guha has signalized six main races with nine sub types.)

আজও এরা বাস্তব ও ভৌগোলিক ভারতে বর্ণ অবয়ব পরিচ্ছদ বৈশিষ্ট্য ভাষা এবং রুচি নিয়ে বসবাস করছে ; স্বাধীন ভারতে ভাষার পার্থক্য হেতু এবং আচার ইত্যাদির পার্থক্য হেতু স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিরোধ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যা নাকি আজ ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিঘ্নিত করছে। রাষ্ট্রনেতারা আজ ঐক্যের সূত্র যেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

অতীত কালে, পুরাণের কালে, একবার প্রচণ্ড বিরোধ বেধেছিল উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের মধ্যে। মহাভারতে আছে বিন্ধ্যপর্বত উত্তর দক্ষিণের মধ্যে এমনই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল যে সূর্যের রথ-পরিক্রমা স্তব্ধ হয়েছিল। আকাশের সূর্য দেবতার গতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে নয়। তার গতি রুদ্ধ হয়নি। গতি রুদ্ধ হয়েছিল মহাভারতের সংস্কৃতি দীপ্তিময় পৌরাণিক সূর্যের। দক্ষিণ সেদিন দ্বার রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের ঋষি অগস্ত্য সেদিন স্বকীয় মহিমায় সেই বাধার বিন্ধ্যাচলকে আনত করে এই সংস্কৃতির সূর্যের গতিকে অবারিত করেছিলেন সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত। ভৌগোলিক ভারতের শত পার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্র ভারতবাসীর মন সেদিন পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারতের সংস্কৃতি সূর্যের দ্বারা

আলোকিত এক অখণ্ড মহাভারতবর্ষে উত্তরায়ণ করেছিল। সেইদিন থেকে বাস্তব ভারতবর্ষের মানুষেরা বহির্লোকে ভিন্ন হয়েও অন্তর্লোকে তারা অখণ্ডনীয় এবং পূর্ণ ঐক্যে গ্রথিত এক মহাভারতবর্ষের অধিবাসী। বর্ণের অবয়ব আকারের ভাষার রুচির বহু পার্থক্য সত্ত্বেও তারা পরস্পরের অভিন্ন, পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও এই মহাভারতবর্ষ আশ্চর্যভাবে অক্ষয় বা কালজয়ী গৌরবে আজও বিরাজিত। বহু সহস্র বৎসরে কোশল মথুরা বৃন্দাবন ধ্বংস হয়েছে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়ে আজ সেই পুরাতন স্থান ও নিদর্শনগুলি প্রত্নতত্ত্বের গণ্ডিভুক্ত, কিন্তু স্তরের পর স্তর মৃত্তিকা পড়েছে তার উপর এবং প্রতি স্তরেই মানুষেরা তাকে নতুন করে গড়ে তাকে নতুন নতুন রূপের মধ্যে চিরপুরাতন বা সনাতন মহাভারতকে জীবন্ত করে রেখেছে। নানান উত্থান পতনের মধ্যে ইতিহাসের কালে প্রাচীন রাজবংশগুলি এবং তাঁদের ঐশ্বর্যময়ী প্রাসাদ ও নগরীগুলি ধূলিসাৎ হয়েছে, কিন্তু তীর্থ ও মন্দিরময় ভারতবর্ষ কালজয় করে বিরাজিত রয়েছে। দূর অতীতকালে এক প্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য প্রদেশের পরিচয় এই মহাভারতীয় পথে ও মহাভারতীয় আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে। পাটলীপুত্র বর্তমান পাটনা এবং বারাণসী ও প্রয়াগকে তুলনামূলক বিচার করলেই এর অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধ হবে। পাটলীপুত্রের মৌর্য সম্রাটের প্রাসাদ ও রাজসভা অনেক খননকার্যের পর আবিষ্কৃত হয়েছে, এমন বিপুল বিরাট প্রাসাদ নগরী মাটির তলায় প্রোথিত হয়ে গেল, খননসাপেক্ষ হয়ে রইল। কিন্তু বারাণসী প্রয়াগ মহাভারতের মহাতীর্থ ও মহানগর কখনও হারায়নি। ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য-সমৃদ্ধি এই বিচিত্র স্থানগুলিকেই অধিক পরিমাণে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মহাভারতীয় এই কেন্দ্রগুলিতেই প্রাচীনকালের শিল্প আজও পর্যন্ত জীবিত আছে। এবং আরও একটা কথা প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরের সংযোগ ও পরিচয় এই মহাভারতীয় পথেই বলতে গেলে অন্তত দশ

আনা, হয়তো তার চেয়েও বেশী বারো আনা; বাকী চার আনা বাস্তব জীবনের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বাস্তব ভারতবর্ষের পথে। সেই প্রাচীনকাল থেকে ওড়িষ্যায় সমুদ্রতটে মহাভারতের যে কোটি কোটি মানুষ এসেছে, পরিচয় করে গেছে, আত্মীয়তা আবিষ্কার করে গেছে, তার একটি স্বল্পাংশ মাত্র ওড়িষ্যায় এসেছে বাণিজ্যক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে ও তাগিদে। ওড়িষ্যা প্রদেশে রাজবংশের উত্থান পতনে বা ওড়িষ্যায় অন্তর্বিপ্লবে কাশ্মীর বা কামরূপ বা কন্যাকুমারীকার অঞ্চলে উৎকণ্ঠা বা ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেনি, তারা এ সংবাদে জানতে চেয়েছে নীলমাধব জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণ তাতে উপক্রুত হয়েছে কি না। সমগ্র ভারতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে। ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ বা ইতিহাসের কালের গণনা মোটামুটি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল থেকেই করা হয়। উত্তর ভারতে ইতিহাসের রাজবংশ, রাজধানীগুলি আজও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয় এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু অমরনাথ বদরীনাথ হরিদ্বার অযোধ্যা বৃন্দাবন মথুরা পুষ্কর কুরুক্ষেত্র বারাণসী প্রয়াগ গয়া এগুলি প্রত্নতত্ত্বের বিষয় নয়। এগুলি আছে। বারবার ভেঙেছে। যতবার ভেঙেছে ততবার গড়েছে। কোনদিন বা দিনেকের জন্যও এই স্থানগুলিতে সুদূর দূরান্তরের যাত্রী সমাগমে ছেদ পড়েনি। হয়তো বা তীর্থগুলির মৃত্তিকার অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে এক এক যুগের এক একটি মন্দির বা নির্দশন চাপা পড়েছে—এর তার উপরের স্তরে আবার গড়েছে। অর্থাৎ লৌকিক বাস্তব ভারতবর্ষে কালে কালে অনেক কিছু ঘটেছে—অনেক ধারা উঠেছে মিলিয়েছে কিন্তু অলৌকিক মহাভারতবর্ষে সেই একটি ধারা নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন রূপে প্রবাহিত। এ কখনও শুষ্ক হয়নি। এতে কখনও ছেদ পড়েনি। বরং নব নব ধারার উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীনধারা থেকে, তার প্রবাহও হয়তো বিপুল এবং বিশাল হয়েছে, কিন্তু আবার সে ধারা সেই প্রাচীনধারার সঙ্গে মিশেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রামায়ণ ও মহাভারতের যে ধারা ভারতের ইতিহাসের ঊষাকালে, তা থেকে বৌদ্ধ এবং জৈন সংস্কৃতির ধারা নির্গত হল। এবং কিছু কালের জন্য এই ধারা এমনই দুরন্তগতি দুস্তর পরিধিতে প্রবহমানা হল যে পৌরাণিক ভারতবর্ষ বা মহাভারতবর্ষের ধারায় ছেদ পড়বে বলে মনে হল। কিন্তু পরবর্তীকালে অবশ্য বেশ কয়েক শত বৎসর পরে মহাভারতের বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে অহিংসা বিনয় প্রভৃতির অনুশাসনগুলি অঙ্গীভূত হয়ে গিয়ে তার পালা শেষ করলে। এখানে আরও একটি বক্তব্য এই যে, বৌদ্ধ ধর্মের এবং জৈন ধর্মের অভ্যুত্থানের মধ্যে মহাভারতীয় ধারাই বিবর্তন পন্থায় নতুন একটি উত্তরণে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিল। তার কারণ বুদ্ধের বাণীগুলির অধিকাংশই মহাভারতের বাণীরই পালিভাষায় নবরূপ! সেগুলি পরমবুদ্ধের জীবনসাধনায় ও তপস্যায় মহিমান্বিতরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠে সেদিন এই মহাভারতের প্রয়োজনেই প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করি গৌতমবুদ্ধের বিশ্ববিশ্রুত বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেককারী শ্লোকটি।—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনাং জিনে।
জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনং।

মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে রয়েছে—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধু সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম।

এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় অনেক আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি মনস্বী উইটার নিংসের একটি উক্তি তুলে ধরেছেন—

"The collection (Dhammapada) has come to conclude some sayings which were originally not Buddhist at all, but were drawn from that inexhaus-

tible source of Indian gnomic wisdom, from which they also found their way into Manus Law book, into the Mahavarata the text of the Jains and into the narrative works such as the Panchatantra." (Hist. of Ind. Literature, Vol. 11, P. 84)

আমার বক্তব্যের অর্থ এই নয় নয় যে, ভারতবর্ষে মহাভারতীয় অর্থাৎ সাধারণ অর্থে হিন্দুধর্মের প্রসার ও প্রভাবেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণধর্ম বা ভারতীয় জনগণের জীবনধাতুর স্বরূপ। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সেই দিক থেকে সর্বপ্রকার গ্লানিমুক্ত এবং জৈব-জীবনের ক্রোধ হিংসা থেকে সমুত্তীর্ণ।

মহাভারতীয় সংস্কৃতি কোন এক বিশেষ ধর্ম নয়। ব্যাপক অর্থে হিন্দুধর্ম বলতে আপত্তি থাকার কারণ থাকতে পারে এবং ধর্ম বললে বহু জনে নাসিকা কুঞ্চন করতে পারেন বলে ধর্মও বলব না। বলব মহাভারতীয় সংস্কৃতি বা দর্শন। এর মধ্যে বহু ধর্ম, বহু দেবতা, নিরাকারবাদ, সাকারবাদ, শূন্যবাদ, বহু আচার, বহু খাদ্য, বিচিত্র বিচার আশ্চর্য উদারতায় স্থান পেয়েছে। কোন বিরোধ সেখানে নেই। এক বিবাহ, বহু বিবাহ, কঠোর বৈধব্যপালন, বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, নারীর পুনর্বিবাহ, ক্ষেত্রজপুত্র সবই স্থান পেয়েছে। মহাভারতে তারা বিধর্মী বিদেশী বলে পরিগণিত হয়নি। কেবলমাত্র তারা সসম্ভ্রমে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে নিয়েছে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-ভরত-হনুমান-জটায়ুর মহৎ আদর্শগুলিকে শ্রেষ্ঠ এবং কল্পলোকের পরম সত্য বলে; সেখানে পৌঁছুনোর জন্যই তারা ভারতের তপস্যা-ভূমিকে আপনাদের জীবনাসন ও মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছে। মহাভারতের কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাই। আদর্শ মেনেছে আর এই চরিত্রগুলিকে ইষ্ট না হলেও পরমপূজ্য বলে গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে এই মহাভারতীয় ধর্মে অহিংসা প্রেম ও করুণার উপলব্ধির মধ্যে যে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করলেন তাঁকেও মহাভারতীয়

সংস্কৃতি দশঅবতারের নবমতম বলে মেনে নিয়েছে। মহাবীরকেও সে অবজ্ঞা করেনি।

আর এক দেবতা দম্পতি। শিব এবং শক্তি। শক্তির দেহ একান্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে গ্রন্থন করে রেখেছে।

যারা এঁদের মেনেছে তাঁদের যে কোন আচার যে কোন ধর্ম-বৈশিষ্ট্য হোক না কেন মহাভারতীয় সংস্কৃতির এবং মহাভারতের মধ্যে তারা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যেই একজাতি একপ্রাণ একতা। একস্বপ্ন। মহাভারতের উপসংহারের মত। স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন। মানুষ একদা স্বর্গরাজ্যের বা রামরাজ্যের সৃষ্টি করবে।

বাহির থেকে বারবার অভিযান এসেছে। তাদের মধ্যে এ দেশে যারা থেকে গেছে এই মহাভারতের আশ্চর্য স্বপ্নে এবং তার পৌরাণিক পরমোজ্জ্বল মহিমায় মুগ্ধ হয়ে, তাকে মেনে নিয়ে, গ্রহণ করে, তারা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট কটাহ, সে কটাহ চাপানো রয়েছে মহাভারতের বিরাট অনির্বাণ জীবনযজ্ঞ হোমানলের উপর; সেই কটাহে আদিযুগ থেকে বহিরাগত মানুষের দল এসে আপন আপন জীবনধাতু ঢেলে দিয়েছে। সংমিশ্রণ হচ্ছে।

প্রথম এই সংমিশ্রণে বাধার সৃষ্টি হল ইসলামের অভিযানে বা আগমনে। তারা এতে মিশল না।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে গেল। মহাভারত তাও খণ্ডিত হল বইকি। ঐতিহাসিক মহেঞ্জদড়ো পেশোয়ারই শুধু ভারতবর্ষের গণ্ডি থেকে খণ্ডিত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের অনেক তীর্থও গেছে।

কিন্তু এই সংমিশ্রণ হল না কেন?

এবং আরও একটা প্রশ্ন জাগে এই যে, ভৌগোলিক এবং ইতিহাসের ভারতবর্ষের মধ্যে যে মহাভারতের কথা উল্লেখ করেছি সে

মহাভারত তো ইসলাম অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত অটুট ছিল, সেখানে তো অভিযান হয়নি, তবু এমন কোন ঐক্যবদ্ধ সংগঠন সেদিন গড়ে উঠল না কেন যা এই ইসলাম অভিযানকে বাধা দিতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে !

ইসলামের অভিযানে প্রথম লক্ষ্য ছিল রাজ্য নয়—লুণ্ঠন, এবং এই লুণ্ঠনের সর্বোত্তম ক্ষেত্র সে আবিষ্কার করেছিল ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে অর্থাৎ রাজার প্রাসাদে বা কোষাগারে নয়—সে-ক্ষেত্র তারা আবিষ্কার করেছিল পৌরাণিক ভারতবর্ষ বা মহাভারত অর্থাৎ দেব-মন্দিরে। দেব-মন্দিরগুলি যুগ যুগ ধরে সঞ্চয় করেছিল অপরিমেয় ঐশ্বর্য মানুষের দেওয়া পূজো থেকে।

তবু যে মহাভারতের গৌরব আমরা করি, যেখানে আমাদের আত্মার ঐক্য নিহিত আছে বলে ভাবছি, সেখান হতেই বা আমরা এমন সংগঠন সম্ভবপর করে তুলতে পারিনি কেন ?

* * *

কেন পারিনি, কেন সম্ভবপর হয়নি সে বহু বিশ্লেষণ ও বহু গবেষণাসাপেক্ষ। তবে মোটা কথা এই যে, জীবনের বাস্তবতা এবং বস্তু সম্পর্ক যা অতি প্রত্যক্ষ এবং মহাসত্য, তা ইতিহাসের আমলে এসে বাস্তব-পরীক্ষায় বাস্তবতাবোধের ক্রমবিকাশের সঙ্গে (এই পৌরাণিক আদর্শ এবং পৌরাণিক সম্পর্কবন্ধন) পুরাতন ও ক্ষীণবল হয়ে পড়েছিল অবশ্যম্ভাবীরূপে। আদর্শ এবং এই কাল্পনিক সম্পর্কের আবেগ ও মমত্ববোধ ক্রমশ মরে গিয়ে ধর্মপালন ও অন্ধ বিশ্বাসের আচারনিয়মে এসে পরিণতি লাভ করেছিল। যেটুকু ঘটবার ঘটেছে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। কিন্তু তা যে কেবলমাত্র সংস্কৃতির দিগ্বিজয় তাতেও সংশয় আছে। সম্রাট অশোকের এই সংস্কৃতির দিগ্বিজয়ের পশ্চাতে সামরিক বল না হোক কতখানি সাম্রাজ্য ও সমারোহ-গৌরব ছিল তাও বিবেচ্য। দ্বিতীয়বার আর একবার কিছু হয়েছিল সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ে। তারপর গুপ্তবংশের সময় একবার দিগ্বিজয়ের মধ্য দিয়ে

বাস্তবতা ও রাজনীতির সূত্রে নানা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত ভারতকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা হয়েছিল।

ইসলামের আমলে এ গ্রন্থি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু নানা ব্যর্থতার জন্য, বিশেষ করে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাবে এ গ্রন্থি বারবার খুলে গেছে, ছিঁড়ে গেছে।

তারপর এসেছিল ইংরেজ। সে দুটি জিনিসই নিয়ে এসেছিল। এক তার বিপুল সামরিক শক্তি ও সংগঠন, দ্বিতীয় তার অতিবাস্তব বিজ্ঞানবাদী ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে দুটিরই অভাব ঘটেছে।

ভারতবর্ষ প্রাচীন আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে তার সামরিক শক্তির সংগঠনকে উপেক্ষা করে এসেছে। অস্ত্রের যুগে নিরস্ত্র থাকবার এই প্রচেষ্টা আদর্শমূলক হলেও অবাস্তব। আদর্শ জীবন বিকাশের মহত্তম কল্পনা তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাকে রক্ষা করবার মত শক্তি যদি না থাকে তবে সে আদর্শ নিরর্থক এবং ব্যর্থ।

অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদী শিক্ষাও পূর্ণরূপে জাতিগত হয়ে উঠতে পারেনি। ভাব ভাবনা ভাষা—জীবনপ্রকাশভঙ্গী আজও পরস্পর বিরোধী। আজও একদল অতিপুরাতনকে আঁকড়ে রয়েছেন, একদল অতি উগ্র আধুনিক অতিক্ষুধার্তের মত বিদেশের যে-কোন উচ্ছিষ্ট নির্বিচারে গ্রহণ করতে উদ্যত, আগ্রহে প্রমত্ত। একদল মধ্যস্থলে অতিবিবেচকের মত অতীতের তেলকে নতুন কালের জলের সঙ্গে মেশাতে চাচ্ছেন।

দেশ আজও দরিদ্র। দারিদ্র্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। ফলে তার পীড়নের আত্মকলহের বিরাম নেই। উদরের অন্ন এবং জীবন প্রাধান্যের জন্য আমরা ব্যক্তি ব্যক্তির প্রতি এবং প্রদেশ প্রদেশের প্রতি বিদ্বিষ্ট। যে বিপুল সমৃদ্ধি ভারতবর্ষের হলে আমরা সুখী একটি যৌথ-পরিবারের মত একস্বার্থে প্রবুদ্ধ হতে পারি তাও আজও সৃষ্টি হতে পারেনি।

ভারতবর্ষের কটাহের তলায় নতুন করে আগুন জ্বালাবার আয়োজন হয়েছে ; আজ বহু জাতির বহু জীবনধাতু ফুটতে শুরু করেনি, গলতে আরম্ভ হয়নি। হলে মিশবে। না হলে কি হবে ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

তার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই বিশ্বাসঘাতকতার সর্বনাশা উপাদান আছে সে সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক না হলে হয়তো তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা কটাহটাকেই চৌচির করে দিয়ে ১৯৪৭ সালের সত্তোদগত ধারায় একটি ছেদ টেনে দেবে। তার ফলে যে চীন আজ শিষ্টতার ও ন্যায়বিচারের নকল ধ্বজা উড়িয়ে পিছিয়ে গেছে সেই চীনই সেদিন লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে মুক্তিদাতা ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নিয়ে হিমালয় বেয়ে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়বে।

আগামীকালে মানবজাতি জাতীয়তার গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করবার যে স্বপ্ন দেখছে তা একদা সফল হবেই। কিন্তু যতদিন না হয় ততদিন পর্যন্ত জাতি এবং জাতীয় সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করতে হবে ; ভৌগোলিক সীমানাকে রক্ষা করতে হবে দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণের মত। তার পূর্বে সেই প্রাঙ্গণ কলুষিত হলে তা হবে মৃত্যুর সামিল। যেদিন সেই বিশ্বরাষ্ট্র, বিশ্বমানব মিলন সম্ভবপর হবে, সেদিন ভারতবর্ষই আহ্বান করবে এস বলে। ভারতবর্ষের এ স্বপ্ন অতি পুরাতন। শঙ্কর অবতার তুল্য শঙ্করাচার্য বলে গেছেন—

"মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ
ভ্রাতরঃ মনুজাঃ সর্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এই ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে। সে তীরে অস্ত্র নিয়ে নয়—সংস্কৃতির, প্রীতির ও ভ্রাতৃত্বের মঙ্গলঘট নিয়ে এস।

—